বাংলাদেশের হ য ব র ল মুসলিম সমাজ
কোরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে ইসলামের খুঁটিনাটি।

জাভেদ আহমদ

(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বইটির কাজ চলছে। মাঝে মধ্যে কিছু কিছু তথ্য সংযোজন করা হচ্ছে। যখনি কোন সংযোজন এবং সংশোধন করা হয় তা তারিখের পরিবর্তন দ্বারা বোঝানো হয় এবং যে অংশটি সংযুক্ত বা পরিবর্তন করা হয়েছে তা লাল বর্ণের "[[" দিয়ে শুরু ও "]]" দিয়ে শেষ দেখানো হয়েছে পুরনো পাঠকের সুবিধার জন্য যাতে করে তাকে পুরো বইটি প্রথম থেকে আবার পড়তে না হয়। শেষ সংযোজন এবং সংশোধন: ২১-০৯-২০১৪)

বাংলাদেশ মূলত একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হলেও এদেশের মুসলমানরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। কয়েক বংশধর ইসলাম বিমুখ থাকাতে এ পরিণতি হয়েছে, যে কারণে অনেক আগে থেকেই ইসলামের পূর্ণ চর্চা এ দেশ থেকে উঠে গিয়েছে। এর জন্য মোঘল আমলের পতনের পর হিন্দু জমিদারদের শাসন মূলত দায়ী। তাদের অন্যায় , অবিচার ও অত্যাচারের পরিনতিতে মুসলমানরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা আলিয়া মাদ্রাসা করাতে লেখাপড়ার মাণ কিছুটা উন্নত হলেও ধীরে ধীরে মাদ্রাসার পড়ালেখার মাণ আবার পরে যায়। অনুরুপভাবে দেওবন্দি কওমী মাদ্রাসারও উৎপত্তি ঘটে ১৭ শতাব্দীতে যা কিনা আজও আছে কিন্তু এই মাদ্রাসা সরকারীভাবে স্বীকৃত নয়। এই দুটি মাদ্রাসার শিক্ষার মধ্যে মূল পার্থক্য হোল , আলিয়াতে ফিকহ শাস্ত্রের উপর জোর দেয়া হয় আর কাওমীতে কোরআন ও সুন্নাহর উপর জোর দেয়া হয় যার কারণে এদেরকে সালাফী বা আহলে হাদিসও বলা হয়।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলতে নামকাওয়াস্তে আরবী ভাষার কিছু কোর্স রেখে মূলত আরবী ভাষা শিক্ষাকে রিতিমত পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। আজ আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা আরবী লিখতে পড়তে পারে ঠিকই কিন্তু কিছু বোঝে না। যার কারণে আমাদের দেশের মুসলমানরা আরবী নির্ভর না হয়ে হয়ে গেছে বাংলা অনুবাদ নির্ভর। এবং এ সুযোগে নানান রকম জাল হাদিস, শিরক এবং বিদআত আমাদের ইসলামে ধুকে গেছে। এখন আমাদের অবস্থা এমনই যে একই পরিবারে দেখা যায় কেউ নামায রোজা করে আর কেউ করে না; কেউ আস্তিক এবং কেউ নাস্তিক। আর যারা ইসলাম মেনে চলে, তারা ইসলামের নামে নামকাওয়াস্তে কিছু চর্চা করে চলেছে যার মধ্যে নিজস্ব মনগড়া বিষয়ই বেশি। উপরন্তু, আজ আমাদের সমাজে হিন্দু রীতিনীতি এমন ভাবে ঢুঁকে গেছে যে আমাদের সাথে আজ হিন্দুদের তেমন কোন পার্থক্য নেই। শুধু হিন্দুই নয় , ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের

রীতিনীতিও আমাদের সমাজে আজ প্রকট। আমরা অন্ধের মত তাদের অনুসরণ করে চলেছি যার পরিণতি অবশ্যই ভয়ানক। দেখুন আল্লাহ্ এবং তার রাসুল (সাঃ) কি বলেছেন-

> *ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:১২০)*

আমদের নবীকে সতর্ক করা মানে আমাদের সতর্ক করা। এবার দেখুন আমাদের নবী (সাঃ) কি বলেছেন-

> *আবু (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের উত্তরসুরিদের ভুল পথ পুরোপুরি এবং অক্ষরে অক্ষুরে আনুসরন করবে; ওরা যদি গিরগিটীর গুহায় ঢোকে তোমরাও ঢুকবে।" আমরা বললাম, "ও আল্লাহ্‌র নবী! আপনি কি ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কথা বলছেন? জবাবে তিনি বললেন, "নয়ত আর কাদের?" (অর্থাৎ, অবশ্যই ইহুদী ও খৃষ্টান)। (বুখারি,Book #56, Hadith #662)*

অতএব দেখা যাচ্ছে, আমরা তাদের যেসব রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তা আমাদের বর্জন করতে হবে, নতুবা আমরা তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেমন , হ্যাপি নিউ ইয়ার (31st Night), বড় দিন বা ক্রিস্টমাস, হ্যালোইণ (Haloween) , ভালবাসা দিবস (Valentine's Day), পূজা, বাংলা নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারী, ফাল্গুন, পহেলা বৈশাখ, ইত্যাদি; কেননা, এগুলোর কোনটাই ইসলামী অনুষ্ঠান নয়। অনেক বিধর্মী , বিজাতীয়, প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি আজ ধর্ম পালনের মত উদযাপিত হয়ে থাকে যেখানে আমদ-ফুরতিই মোক্ষম উদ্দেশ্য। এসব অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া বা পালন করার অর্থ হোল এগুলকে মেনে নেয়া, স্বীকৃতি দেয়া এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। অথচ আল্লাহতায়ালা ঐ সকল রীতিনীতি ও ধর্মকে বাদ দিয়ে ইসলামকে গ্রহণ করতে আমাদের আদেশ করেছেন -

> *...আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন*

হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। (সূরা আল মায়েদাহ - ৫:৩)

ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম আল্লাহ্‌র কাছে আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সেকুলার সরকার ধর্মনিরপক্ষতার নামে অন্যান্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেছে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে। এখন দেখা যায় বড় বড় অনুষ্ঠান শুরু হয় কোরআন ছাড়াও গীতা, ত্রিপিটক এবং বাইবেল থেকে পাঠ করে। তাহলে কি আমাদের সরকার অন্য সব ধর্মকে বৈধ করার প্রচেষ্টা করছে যা কিনা আল্লাহতালা নিজেই বাতিল করেছেন? বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের সরকারের লোকজনের মধ্যে আর আল্লাহ্‌র ভয় নেই। তাই তিনি আমাদের আরও বলেছেন -

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল ইমরান - ৩:১০২)

এই আয়াত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামের বাইরে অর্থাৎ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করবেন না। অতএব, আমাদের সর্বত সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে আমরা যেন ইসলাম থেকে খারিজ বা বাদ পড়ে না যাই। সেকুলার গণতন্ত্রের নিয়ম ধরলেও আমাদের সরকার এহেন কাজ করতে পারেন না; কেননা, এখনও এদেশের বেশীরভাগ মানুষ মুসলমান। গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের সুত্র ধরেও ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রথম ধর্ম। ঐ সকল অনুষ্ঠানে বড় জোর হাতেগোনা গুটিকয়েক বিধর্মী হয়ত থাকতে পারে। এবং ঐ সংখ্যা লঘুদের ধর্মীয় স্লোগান শোনার কোন মুসলমানের প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের থেকে আমাদের ধর্ম বিষয়ে কোন কিছু শেখার নেই। ইসলাম আমাদের জন্য পরিপূর্ণ ধর্ম। বরং ওদেরই অনেক কিছুই শেখার আছে ইসলাম থেকে। তাছাড়া, এই প্রথা হোল একটি বিদআত। কোরআন তিলাওয়াত করে কোন অনুষ্ঠান শুরু করার কোন নজীর ইসলামের ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যায়না। বরং এটাই পাওয়া যায় যে, মুসলমান কোন বক্তা কোন অনুষ্ঠানে বা আলোচনায় বক্তব্য শুরু করার আগে সবাইকে সালাম জানিয়ে, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" (অর্থাৎ, পরম দয়াময় ও করুনাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ) বলে শুরু করেন, যেমনটি করতেন আমাদের নবী (সাঃ) এবং ওনার অনুসারীরা। এটাই যথেষ্ট।

আমোদ ফুর্তির জন্য নবী (সা:) আমাদের জন্য বৎসরে দুটি ঈদ উৎসব পালন করতে বলে গেছেন -

> *উম্ম আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আমাদের আদেশ করা হয়েছে সপরিবারে পুরুষ-মহিলা সবাইকে নিয়ে, এমনকি মাসিক অবস্থায় নারীসহ দুই ঈদ উৎসব সদলবলে উৎযাপন করতে। তবে মাসিক অবস্থারত নারীদের কে মুসাল্লা থেকে দূরে থাকতে বোলো। অতঃপর এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, "ও আল্লাহর নবী, যাদের হিজাব বা বরখা নেই তারা?" তিনি বললেন, "তাদেরকে তাদের সাথীর হিজাবে আশ্রয় নিতে বল।" (বুখারি, Book #8, Hadith #347)*

ঈদ ছাড়া আমরা আর যে সব উৎসব পালন করি সেগুলো নাজায়েজ বা পালন করা নিষিদ্ধ। যেমন ধরুন, ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছেলে মেয়ে সবাই মিলে প্রভাত ফেরীর নামে শহীদ মিনারে ফুলের তোড়া দেয়া, সাজগোজ করে ছেলে মেয়ে মিলে পহেলা বৈশাখ উৎযাপন করা, ইত্যাদি। শহীদ মিনারে ফুলের মালা দিলে শহীদদের কোন উপকার হয় না এবং ঐ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তাদের কাছে পৌছায় না। বরং ঐ দিন আমরা সবাই মিলে যদি যার যার বাসায় বসে নফল নামায পরে তাদের জন্য দোয়া দরুদ পরে বখশে দেই সেই সওয়াব তাদের রুহের কাছে পৌছে যাবে এবং তাতে তারা উপকৃত হবেন।

> *উকবা বিন আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (সা:) উহুদ যুদ্ধের শহিদদের জানাজা নামায পরলেন তাদের মৃত্যুর আঁট বৎসর পর যেন তিনি জীবিত এবং মৃতকে বিদায় জানাচ্ছেন, তারপর বক্তৃতার মঞ্চে উঠে বললেন, "আমি তোমাদের পূর্ব -বংশের একজন, তোমাদের সাক্ষী, এবং আমার সাথে শেষ বিচারের দিনে তোমাদের আবার দেখা হওয়ার প্রতিশ্রুত যায়গা হচ্ছে আল-হাউদ (কূপ), আমি আমার যায়গা থেকে তা দেখতে পারছি। আমার বিশ্বাস তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করবে না, কিন্তু আমার ভয় হয় যে তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করবে। "সেটাই ছিল নবীকে আমার শেষ দেখা। "(বুখারি, Book #59, Hadith #374)*

এ প্রসঙ্গে আরও বলে রাখা প্রয়োজন যে, "শহীদ" এর অর্থ নিয়ে আমাদের ভুল ধারনা রয়েছে। ভাষা আন্দলনের জন্য যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তারা শহীদ নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে শহীদ শুধু তারাই যারা আল্লাহ্ জন্য বা তার কোন আদেশ পালনের কারণে অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে মৃত্যুবরণ করে। যেহেতু ভাষা সৈনিকরা বাংলা ভাষার জন্য মারা গেছেন , তারা বীর হতে পারে, কিন্তু শহীদ নন।

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সূরা আল আহযাব - ৩৩:২৩)

একজন শহীদের মর্তবা অনেক। আমাদের দৃষ্টিতে তারা মৃত হলেও , আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তারা জীবিত এবং সম্মানিত -

আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:১৫৪)

সুযোগ পেলেই যত্রতত্র "মিনার" তৈরি করে মৃতদের সম্মান দেখানোর রীতি হচ্ছে বিধর্মীদের আচরণ যা আমরা অন্ধের মত অনুকরণ করে চলেছি বেক্তিগত বা ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিকে অনেক সাহাবা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুবরণ করে শহীদ হয়েছেন ; অথচ, তাদের সম্মানে কোন সৃতি স্তম্ভ বা মিনার তৈরি করা হয়নি। আমরা যা করছি , তা ভুল এবং ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। অন্ধের মত বিধর্মীদের অনুসরন ও অনুকরণ করলে আমাদের পরিণতি হবে ভয়ানক। আল্লাহ্‌ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে দজখের আগুনের ইন্ধন হচ্ছে মানুষ এবং প্রস্তর বা ইট -পাথর যা দিয়ে আমরা স্তম্ভ-মিনার তৈরি করছি -

মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (সূরা আত-তাহরীম - ৬৬:৬)

মৃত ব্যক্তিদের আত্মা কোন কবর বা স্তম্ভ বা মিনারে অবস্থান করেনা; তাদের আশ্রয় বারজাখ বা একধরনের পর্দার অন্তরালে পৃথিবী এবং প্রথম আসমানের মাঝামাঝি কোন যায়গায় -

যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরা আল মু' মিনূন - ২৩:১০০)

একজন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। তার তখন আর কোন কিছু করার ক্ষমতা থাকে না ; নিজের জন্যও না, অন্যর জন্যও না। সে তখন হয়ে যায় পুরোপুরি নিরুপায়। এমন অবস্থায় আমরা যা দোয়া দরুদ তাদের জন্য পাঠাই তাই তাদের কাজে লাগে বা লাগতে পারে যদি কিনা আল্লাহ্ তা কবুল করেন। তাদের কবরে ফুল দিলে, বা মিনারে ফুল দিলে বা উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনে বা "আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো" গান গেয়ে তাদের কোন ফায়দা হয়না। এসব হচ্ছে ভিনদেশী ভিত্তিহীন ভীমরতি মাত্র।

জাহিলিয়া যুগের আরবেরা এক আল্লাহ্য় বিশ্বাস করতো ঠিকই , কিন্তু সাথে শিরক করতো আল্লাহ্ এবং তাদের মাঝে পুতুল ও মূর্তি বসিয়ে।

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না। (সূরা আল আনকাবুত - ২৯:৬৩)

তারা সরাসরি আল্লাহ্র কাছে এবাদত না করে, সেই সব মূর্তি প্রতিমার মাধ্যমে আল্লাহ্কে ডাকতো। আজ আমরাও ঠিক তাই করছি আমাদের এবং আল্লাহ্র মাঝে স্তম্ভ ও মিনার দার করিয়ে। তাই আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন -

অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। (সূরা ইউসূফ - ১২:১০৬)

যেদিন আমাদের সব আমল পরীক্ষানিরীক্ষা করা হবে, সেদিন আমাদের বেশীর ভাগ আমলই বাতিল হয়ে যাবে শিরক যুক্ত থাকার কারণে -

যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (সূরা আত্ব-তারিক্ব - ৮৬:৯-১০)

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তার সারাটি জীবন সচেষ্ট ছিলেন আমাদের দজখের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য, আর আমরা সর্বদা সচেষ্ট আগুনে ঝাপ দেয়ার জন্য -

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র রাসুলকে বলতে শিনেছি, "আমার অবস্থা হচ্ছে সেই লোকের মত যে কিনা আগুন প্রজ্জলিত করল, এবং যখন সেই আগুন আশেপাশে আলো ছড়াল, পোকামাকড় সেই আগুনে ঝাপ দিতে লাগলো। লোকটি তার যথা সাধ্য চেষ্টা করতে লাগলো তাদের আগুনে পড়া থেকে বাধা দিতে, কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠেনা। অনুরূপভাবে, আমিও তোমাদেরকে আগুনে পড়া থেকে তোমাদের কোমরের বেল্ট টেনে ধরে রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু তোমরা সেই আগুনেই পড়ার জন্য উদগ্রীব।" (বুখারি, Book #76, Hadith #490)*

অতএব, মূর্খের মত সব হাস্যকর আঁচার আচরণ ও কাণ্ড কীর্তি ছেড়ে দিয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হয়ে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে দজখের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

আমাদের দেশে শিক্ষার হার এমনিতেই অনেক কম, তার ওপর আমরা যারা লেখাপড়া জানি তারা ইসলাম নিয়ে কোন লেখাপড়া করিনা; লোকে যা বলে তাই শুনি এবং অনুসরণ করি। যার কারনে আজও এদেশে ওয়াজ-মহফিল চলে। তথাকথিত আলেম এবং মোল্লারা রুপকথা ও গাল-গপ্প শুনিয়ে মানুষকে তাদের নিজেদের সেবার জন্য মুরিদ বানিয়ে রেখেছে। অথচ, আল্লাহ্‌ তালা কোরআনে পরিষ্কার সতর্ক বানী দিয়েছেন -

> *তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত...হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (সূরা আত তাওবাহ - ৯:৩১,৩৪)*

রাস্তার পাশে সস্তায় বিক্রি হওয়া চটি নামাজ শিক্ষা বই-পত্র কিনে আমরা তাড়াহুড়ো করে কমসময়ের মধ্যে কিছু ইসলাম শেখার চেষ্টা করি। সে সব বইয়ে কোরআন হাদিসের কোন দলিলের উল্লেখ থাকে না এবং সেগুলোতে অনেক মনগড়া বিষয় লেখা আছে যার অস্তিত্ব ইসলামের মূল বইগুলোতে পাওয়া যায়না।; যে কারণে অনেক ভুল ত্রুটি রয়ে গেছে

আমাদের ইসলাম চর্চার মধ্যে। ধর্মীয় কোন বই পড়ার সময় লেখকের বা অনুবাদকের পটভূমি জানা দরকার। বাজারের সব ইসলামী বই সহিহ নয়, এবং সব লেখক ইসলামের গুরু নন।

অনেকেই নিম্নক্ত হাদিস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ইসলামী বিষয়ে বই লিখে থাকেন -

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন - যখন একজন মারা যায়, তার সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়; তিনটি ছাড়া, অনবরত দান, **জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয়**, এবং একজন ধার্মিক ছেলে সন্তান যে কিনা তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম, Book #013, Hadith #4005)*

কিন্তু আমাদের জেনে রাখা দরকার যে সবার ইসলাম সম্পর্কে বই-পত্র লেখার যোগ্যতা নেই। নবীর (সাঃ) অনেক সাহাবা অনেক হাদিস বলা থেকে বিরত ছিলেন এই ভয়ে যে, ভুল বশত হয়ত কিছু বলে ফেলতে পারেন বা কেউ তার নাম দিয়ে জাল হাদিস বানাতে পারে -

> *আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে বিষয়টি আমাকে অনেক হাদিস বলা থেকে বিরত রাখে তা হোল, নবী (সাঃ) বলেছেন, "যে আমার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলল, সে অবশ্যই দোযখে একটি জায়গা পাবে।" (বুখারি, Book #3, Hadith #108)*

অতএব, কেও ভুল বা ইচ্ছাকৃত কোন তথ্য তার বইয়ে পরিবেশন করলে বা কোন তথ্য গোপন করলে সেই বইটি তার জন্য সওয়াবের পরিবর্তে দজখের আগুন নিরধারিত করে রাখবে। দেশে এক সময় অবস্থা এমন ছিল যে, অনেকে অনেক ইসলামী বই-পত্র লিখে ছাপিয়েছেন কিন্তু ঐ সব বইয়ে নানান রকম আজগুবি গাল-গপ্প রয়েছে যার কোন সূত্র উল্লেখ নেই। বলা হয়ে থাকে আমাদের দেশে তিন লক্ষ্যরও বেশি জাল হাদিসের প্রচলন আছে! এবং তার অনেক গুলই শীয়াদের থেকে আসা। অতএব, মানুষজন ঐ সব বই-পত্র পড়ে অন্যদের বলে বেড়িয়েছেন। আজও অনেক মসজিদের ইমাম ঐ সব ভিত্তিহীন গল্প খুৎবায়, ওয়ায মহফিলে শুনিয়ে থাকেন এবং মানুষ তা শুনে যাচ্ছে এবং বিশ্বাস করছে। সওয়াবের আশায় বা দু-পয়সা কামাবার আসায় ইচ্ছে মত ইসলামী বই লিখতে গিয়ে বা ওয়ায মাহফিলে বক্তৃতা করতে গিয়ে যারা বানিয়ে বানিয়ে হাদিস লিখেছেন বা বলছেন, অখ্যাত ও দুর্বল হাদিস সমুহকে প্রাধান্য দিয়েছেন বা দিচ্ছেন , তারা তাদের সব আমল নষ্ট করে দোযখে জায়গা করে নিয়েছেন - হায় আফসোস!

অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:৭৯)

আমি তিরিশ বৎসরের বেশি ইসলামে থেকে পড়াশোনা করে অনেকটা হতাশ হয়েই এই বইখানা লিখতে বশেছি। খেয়াল করলে দেখবেন যে আমি আমার নিজস্ব কোন ধ্যান ধারনার প্রশ্রয় দেই নি। চেষ্টা করেছি সংশ্লিস্থ সূত্র থেকে সর্বজনবিদিত শুধু গ্রহণযোগ্য উল্লেখ সমূহ আনতে। আর যে সব উদাহরণ দেয়া হয়েছে তার সবই বাস্তব ঘটনাবলি থেকে নেয়া। বানানো কিছু নেই। আমি যা যেভাবে বুঝেছি তাই লিখেছি। আমার বোঝার কোন ভুল থাকলে আমি আপনাদের কাছে এবং আমার আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমাকে প্রমানাদী দিয়ে শুধরে দিলে উপকৃত হব।

ইদানীং অবশ্য লেখকেরা অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করেন। তারা কোরআন এবং সহিহ হাদিসের সূত্র ছাড়া কোন বই প্রকাশ করেন না। বেশীরভাগ বই বর্তমানে গবেষণা নির্ভর। আমিও চেষ্টা করেছি তাই করতে। যে ভুলটা মুসলিম গবেষকরা ইসলামী বিষয়ে করে থাকেন তা হোল, তারা সেকুলার পন্থায় (অর্থাৎ, যেভাবে তাদের দুনিয়াবি শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হয়েছে) ইসলামী গবেষণা করে থাকেন। যার কারনে তারা কোরআন হাদিস ছাড়াও অন্যদের ধ্যান ধারণা ও মতবাদ টেনে আনেন, যা নিতান্ত অমুলক। ইসলামে যুক্তি চলে না, চলে দলিলের প্রমাণাদি। কেননা, ইসলাম ধর্মে আর নতুন কিছু যোগ বা বিয়োগ করার আর কোন সুযোগ নেই। ইসলাম এখন একটি পরিপূর্ণ ধর্ম -

তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ন করে দিয়েছেন? এমন লোক ও আছে; যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করে। (সূরা লোকমান - ৩১:২০)

ইসলামকে আমাদের বুঝতে এবং মানতে হবে যেমনটি আছে ঠিক তেমনি -

মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। (সূরা আন-নূর - ২৪:৫১)

তবে হাঁ, কোরআন এবং হাদিসের নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সুযোগ থাকতে পারে যা কিনা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তারের সাথে সাথে আমাদের বোঝার ক্ষমতাও বাড়াতে পারে। কেননা আল্লাহ্তালা বলছেন,

এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (সূরা হা-মীম সেজদাহ - ৪১:৫৩)

অর্থাৎ, সময়ের অন্তরালে ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তার বিভিন্ন রহস্য উন্মোচন করবেন। সেখানেই লেখক, গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা বই-পত্র লিখতে পারেন মানুষের বোঝার সুবিধার জন্য। শুধু ইসলামী বই নয়, যে কোন উপকারি বই-পত্র লিখলেই সওয়াব হতে পারে। যেমন ধরুন, ডাক্তারি, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলী বিষয়ক বই-পত্র, ইত্যাদি। সাগর সগীর নামক এক ভদ্রলোক অকুপ্রেসারের উপর একটি বই লিখেছেন যা কিনা অনেকের জন্য উপকারী। এ ধরনের বই থেকেও সওয়াব পাওয়া যাবে।

অনেকে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোচনা শুনতে যান। যদিও এতে কোন দোষ নেই, কিন্তু যে পরিমাণ টাকা এতে খরচ করা হয় সেই পরিমাণ টাকা বা তার চেয়ে কম খরচে পুরো এক সেট হাদিস শরিফে র বই কিনতে পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে একজনের খরচ হয় চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা ; এই পরিমাণ টাকা দিয়ে আপনি বুখারি শরিফ , মুসলিম শরিফ, সুনান আবু দাউদ, মালিক মুয়াত্তার সম্পূর্ণ বইয়ের সংকলন কিনতে পারবেন। আর এসব বই হাতের কাছে থাকা মানে ইসলামের একটি বড় জ্ঞান ভাণ্ডার হাতের কাছে থাকার সমান। একটি লেকচার এ আপনি হয়ত কয়েক ঘণ্টা বসে থেকে সুধু দু একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন , কিন্তু ঐ সময়ে একটি হাদিসের বই পড়লে অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন সম্ভব। আমরা কোরআন

এবং হাদিসে যা পাই তাই আমাদের অনুকরণীয় ও পালনীয় , আর ইতিহাস এবং সাহাবীদের গল্প-কাহিনী থেকে যা পাই তা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা মাত্র।

আমরা একদিকে অমুসলিমদের মত জীবনযাপন করছি এবং অন্যদিকে নিজেদের মুসলমান বলেও দাবি করে যাচ্ছি। আমরা বেশীরভাগই দুই নৌকায় পা দিয়ে আছি। ঠিকমত এবাদত করতে না পারলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবেনা এবং তার সুফল পাওয়া যাবেনা, এটাই স্বাভাবিক।

মক্কার নূর পর্বতের হেরা গুহায় যে আয়াত প্রথম নাজেল হয় তা হল –

> *পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (সূরা আলাক - ৯৬:১৯)*

অথচ এ দেশের মুসলমানেরা কুরআন বুঝে পাঠ করা ছেড়ে দিয়েছে বহু আগেই। কেউ কেউ আরবীতে কোরআন তেলাওয়াত করলেও তার অর্থ বোঝেনা। সাথে সাথে ছেড়ে দিয়েছে নবীর সুন্নাহ। নবী করীম (সা:) তার বিদায় ভাষণে বলেছিলেন –

> *...হে মানুষ, আমার পরে আর কোন নবী আসবেনা এবং নতুন কোন ধর্মও জন্ম নেবে না। অতএব, হে মানুষ, যুক্তি দিয়ে আমার কথাগুলো বুঝে নাও। **আমি দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি, কুরআন এবং আমার দৃষ্টান্ত সমূহ যা কিনা সুন্নাহ;** তোমরা যদি এ দুটিকে পড় এবং অনুসরণ কর তাহলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবেনা। আজ যারা আমাকে শুনলে, অবশ্যই আমার কথা গুলো অন্যদের বলবে, এবং যারা শুনবে তারাও অন্যদের বলবে; যারা আমার কথা শেষে শুনবে তারা যেন আমার কথা তাদের চেয়েও ভাল বোঝে যারা আমার কথা সরাসরি শুনলো। ও আল্লাহ্‌! আপনি সাক্ষী, আমি আপনার সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। (অনুবাদ সূত্র: http://www.islamicity.com/mosque/lastserm.HTM)*

শুধু বিদায় হজ্জের ভাষণেই নয় , অনেক হাদিসেও ঐ একি মন্তব্য পাওয়া যায় [এই হাদিসগুলো দেখুন - বুখারি , Book #92, Hadith #381; Book #92, Hadith #415; Book #92, Hadith #387; Book #92, Hadith #415; Book #92, Hadith #382]।

এমতাবস্থায়, আমাদের ইসলাম চর্চাকে সঠিক এবং সুন্দর করতে হলে আমাদেরকে ইসলাম নূতন করে শিখতে হবে সরাসরি কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে। এ দুটি উৎস থেকে ইসলাম শিখলে এবং চর্চা করলে কোন ভুল এবং বিপদের আশঙ্কা নেই।

উপরল্লেখিত হাদিস অনুযায়ী আমাদের ইসলাম শিক্ষার কার্যক্রম নিম্নরূপ হওয়ার কথাঃ

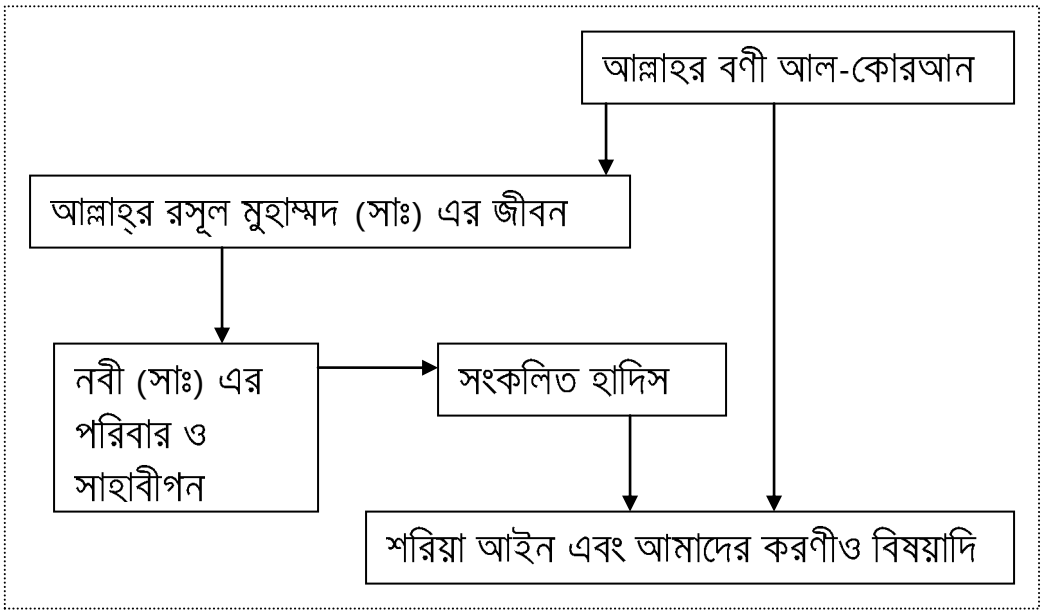

কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে আছে নিম্নরুপঃ

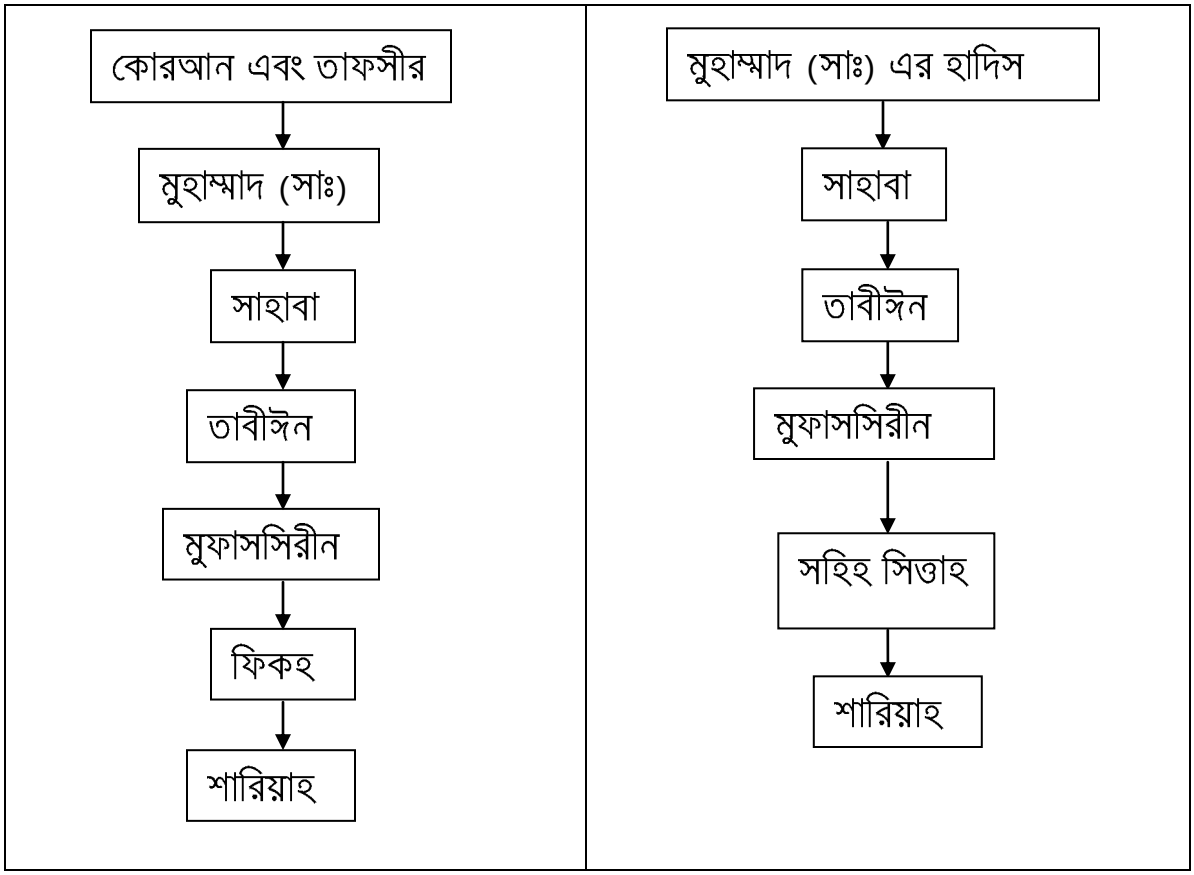

অর্থাৎ, সাহাবাগনের পর থেকে শারিয়াহ আইন পর্যন্ত তাবীঈন (যাদের জন্ম নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর কিন্তু সাহাবাদের সান্নিধ্য পেয়েছেন) এবং মুফাসসিরীনদের (যারা কোরআন কে সহজ ভাষায় বা অনুবাদ করে ব্যাখ্যা করেন) ধ্যান ধারণা ও বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়ে গেছে। অন্যদিকে, সহিহ সিত্তাহ বলতে ইসলামের মূল ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে বোঝায়; এবং সেগুলো মূলত - বুখারী, মুসলিম, আবু দাউওদ, মালিক মুয়াত্তা, তিরমিযি, ও ইবনে মাজাহ'র হাদিস সংকলন সমূহ।

ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের সবচেয়ে আগে পড়া উচিত নিজের মাতৃ ভাষায় - পবিত্র কোরআন, যা কিনা সরাসরি আল্লাহ্‌র বানী -

> *আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (সূরা আল ক্বামার - ৫৪:১৭, ২২, ৩২ এবং ৪০)*

এর পর পড়া উচিত আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনী, এবং সব শেষে তার সহিহ বানী বা হাদিস সমূহ। তারপরই আমরা ইসলামের একটা ভিত্তি উপর দাঁড়াতে পারব ভাল-মন্দ যাচাই-বাছাই করার জন্য। একবার এই ভিত্তি আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আমাদের আর কেও ধোঁকা দিতে পারবে না।

আমরা ইসলাম শেখার এবং বোঝার জন্য কয়েক' শ এমনকি হাজার খানেক বই-পত্র পড়ে থাকি; অথচ, মাত্র ৪১ টি বই পড়লেই আমাদের সিংহ ভাগ ইসলাম জানা ও শেখা হয়ে যায়। যেমন ধরুন,

১. আল কোরআন - ১ খণ্ড।
২. সহিহ বুখারি - ১০ খণ্ড।
৩. সহিহ মুসলিম - ৭ খণ্ড।
৪. সুনান আবু দাউদ - ৫ খণ্ড।
৫. সুনান মালিক মুয়াত্তা - ২ খণ্ড।
৬. সুনান তিরনিযি - ৬ খণ্ড।
৭. সুনান নাসাঈ - ৫ খণ্ড।
৮. মুসনাদে আহমদ - ২ খণ্ড।
৯. সুনান ইবন মাজাহ - ৩ খণ্ড।

সর্বমোটঃ ৪১ টি বই।

+

আল-কোরআন আল-হাদিস

আমাদের ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার এবং অন্যান্য বেশ কিছু ইসলামী প্রতিষ্ঠান অনেক বই বাংলাতে অনুবাদ করেছে। তার মধ্যে কুরআন এবং হাদিসও আছে যা আপনারা সহজেই কিনতে পারেন তাদের বায়তুল মোকাররম এর দোকান থেকে অথবা কাঁটাবন মসজিদের বই মার্কেট থেকে এবং নিজ নিজ বাড়িতে ব্যক্তিগত ইসলামী পাঠাগার গড়ে তুলতে পারেন পুরো পরিবারের পড়াশুনার জন্য।

ইসলাম বুঝে পড়া এবং শেখা জরুরী, বিশেষ করে আরবী ভাষা যা কিনা ইসলামের ভাষা। আরবী ভাষা শেখার সাথে সাথে বাংলাতে তার অর্থ বুঝে নেয়া দরকার। বিস্তারিত জানা থাকলে জিনিষগুলো মনে রাখতে এবং আমল করতে সহজ হয়। কিন্তু অসুবিধাটা হোল, ইসলামের সব তথ্য বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি; এমনকি ইংরেজিতেও নয়। অতএব, আরবী ভাষা শিখলে ইসলামের পুরো জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়ে যাবে। কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এবং আমাদের নবী (সা:) আরবী ভাষাভাষী ছিলেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমান এর উচিত আরবী ভাষা শেখা। ইমাম আল-শাফি তার আল-দাহাবির সিয়ার আলাম আল-নুবলা ১০:৭৪ এবং সওয়ান আল-মান্তিক এর আল-সুয়ুতির ১৫ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন - *"মানুষের মধ্যে অবিদিত এবং ভিন্নমত তখনই শুরু হয় যখন তারা আরবী ভাষা ছেড়ে এরিস্টটলের ভাষা গ্রহন করল।"* অর্থাৎ, আরবী ভাষা বিসর্জন দেয়ার পর থেকেই মুসলমানদের অধপতন , গোঁড়ামি ও ভুল বোঝাবুঝি শুরু হল। অথচ , আল্লাহ্ তালা নিজেই বলছেন কোরানের আরবী একটি সহজ ভাষা -

> *আমি একে আরবি ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা ইউসূফ – ১২:২)*

আমরা সালাত আদায় করি মুখস্ত কোরআনের আরবী সূরা পড়ে , অথচ আমরা কি পড়ছি তা মটেও বুঝি না! আমরা জানিই না যে আমাদের সালাত কবুল হচ্ছে না। কেননা , অর্থ না বুঝে সালাত আদায়ের কোন উপকারিতা নেই -

> *হে ঈমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে যেও না) ফরয গোসলের আবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-তাতে মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। (সূরা আন নিসা - ৪:৪৩)*

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে সালাত মনোযোগের সাথে বুঝে পড়া জরুরী। নতুবা ঐ সালাতের কোন উপকারিতা নেই। আরবী ভাষা না জানলে কি করে তা বুঝবো ?

আরবী না জানা পর্যন্ত আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে এই যে, আমরা মতিউর রহমান খান অনুদিত দশ খণ্ডের "শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ" থেকে আমরা সাধারণত যে সব সূরা সালাতে পড়ে থাকি সেগুলোর অর্থ ভাল করে বুঝে নেই যাতে করে সালাতের সময় সেই অর্থগুলোর উপর মনোনিবেশ বা খেয়াল রাখতে পারি কি পড়ছি তা বোঝার জন্য। তাহলেই ইনশাআল্লাহ্ সালাতের শর্ত পূরণ হবে এবং তা কবুলের সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যাবে।

ইহুদীরা তাদের ধর্মের খাতিরে হিব্রু ভাষা শেখে; খৃষ্টানরা শেখে গ্রীক এবং আরমাইক ভাষা; আমাদেরও উচিত আরবী শেখা। আরবী ভাষা না শিখে ইসলাম শেখা অপূর্ণ থেকে যাবে। মুঘল আমলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বাংলা ছাড়াও আরবী , ফার্সি এবং উর্দুতে পারদর্শী ছিলেন। আমাদেরও উচিত তাদের মত আবার আরবী রপ্ত করে ফেলা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট এ নিয়মিত আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করা হয় যার বিজ্ঞাপন সময়ে পত্রিকায় দেয়া হয়। আবার কোন কোন যায়গায় বিনা মূল্যে কিছু কোর্সও করানো হয়। প্রাইভেট কিছু ইন্সটিটিউট এও আরবী ভাষা শেখানো হয় তার মধ্যে একটি হোল ঢাকার উত্তরা ৬ নং সেক্টরে। তারা দুই-হাজার টাকার

বিনিময়ে তিন মাসের একটি কোর্স পরিচালনা করে। আগ্রহ থাকলে, বিস্তারিত জানার জন্য তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন - ০১৭২২০১৭৭৯২, ০১৭১১৭৩৯৫২৬ ।দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ও আরবী ভাষার ওপর সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

অনেকের ধারনা, আরবী ভাষা শেখা কঠিন। তা আসলে ঠিক নয়; আমি তা টের পেয়েছি কিছুদিন একটি অবৈতনিক আরবী ভাষা প্রোগ্রামে (পরিবাগের টেলি যোগাযোগ ভবনের নামাজ ঘরে পরিচালিত ইয়াহিয়া ভাই এর কোর্স) গিয়ে। তুলনামূলক ভাবে, কোরআনিক আরবী শেখা আরও সহজ কেননা সেখানে বহু শব্দের পুনরাবৃত্তি রয়েছে । ভাষা শেখা শুরু করলেই ধীরে ধীরে সব উপলব্ধি করতে পারবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট এ পরিচালিত তিন মাসের আরবী ভাষার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত কোর্সে গিয়ে আমি আরবি ভাষার আরও কিছু ধারণা পেয়েছি । কিন্তু, যেতে হবে আরও বহুদুর। একটি ভাষা পুরোপুরি শিখতে চর্চা, চেষ্টা এবং সময় লাগে।

সরাসরি কুরআন এবং হাদিস থেকে ইসলাম শিখলে ভুল ত্রুটির সম্ভাবনা কমে যায় এবং বিদআত (অর্থাৎ ইসলামর নামে উদ্ভাবিত / আবিষ্কৃত কার্যকলাপ) থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমাদের পাড়ার এতিমখানার (দারুল কোরআন একাডেমী, মধুবাজার, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা) ম্যানেজার ২০১১ সালে হজ্জ থেকে ফিরে এসে জানালেন যে, তিনি মদীনাতে এক দেশী শায়খের দেখা পেয়েছিলেন যিনি তাকে দুঃখের সাথে সতর্ক করলেন বাংলাদেশে বিদআতের প্রচলন এবং প্রাদুর্ভাবের কথা উল্লেখ করে; এবং অনুরোধ করেন এ বিষয়ে দেশে ফিরে কাজ করার জন্য। আমাদের দেশের মুসলমানেরা আরবী না জানার কারণে বিভিন্ন লোকের বই অনুবাদ পড়ে এবং গাল-গপ্পে ভরা ওয়াজ-মাহফিলে গিয়ে ইসলাম শিখে এবং চর্চা করতে গিয়ে অনেক নতুন বিদআত অনুসরণ করে চলেছে; অথচ, ইসলামে বিদআত অর্থাৎ নতুন ধর্মীয় চর্চা আবিষ্কার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

> *আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বলেন, "আমার কিছু সহচরী আমার কাছে আমার হ্রদের ফোয়ারাতে আসবে, এবং আমি তাদের চিন্তে পারলে তাদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে; আমি তখন তাদের ডাকব, "ওহে আমার সহচরীরা!" তখন আমাকে বলা হবে, "আপনি জানেন না আপনার বিদায়ের পর তারা কি কি নতুন বিদআত আবিষ্কার করেছিল।" (বুখারি, Book #76, Hadith #584)*

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রাসুল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর থেকেই বিদআতের আবির্ভাব ঘটে এবং আবু বকর (রাঃ) এর পুরো খিলাফার সময় এসব বিদ্রোহ দমনে কেটে যায় ; এবং তা প্রকাশ্যে ও গোপনে চলতে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে আবু বকর (রাঃ) ছাড়া পরবর্তী সব খলীফা - ওমর আল খাত্তাব (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী আবু তালিব (রাঃ), এবং ইমাম হাসান (রাঃ) সকলেই আততায়ীর হাতে নিহত হন। এতদসত্তেও, ইসলামের অগ্রযাত্রা স্থিমিত হয়ে যায় নি; ঠিক যেমনটি আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা করেছেন -

> *তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (সূরা আত তাওবাহ - ৯:৩৩)*

কাতার টিভি ওমর সিরিজ নামক ৩০ খণ্ডের একটি ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক ছবি করেছে যা কিনা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ের কিছু অংশ থেকে শুরু করে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমরের (রাঃ) সময়কাল পর্যন্ত ঘটনা সমূহ দেখানো হয়েছে খুব সুন্দর করে প্রকৃত ইতিহাসের আলোকে যা আপনারা ইন্টারনেট Google এ “Umar Series” খুজলে পেয়ে যাবেন। আমি অনুরধ করব, আপনারা অবশ্যই সময় করে ঐ ছবিগুল দেখবেন।

বিদআতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা আরও একটি হাদিস পাই -

> *জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: যখন আল্লাহর নবী (সা:) ভাষণ দিচ্ছিলেন, ওনার চোখগুলো লাল বর্ণ ধারণ করল, কণ্ঠস্বর উচ্চ হোল, এবং রাগান্বিত ভাবে বলতে লাগলেন যেন তিনি কোন শত্রুর বিরুদ্ধে কথা বলছেন, "তোমাদের শত্রু তোমাদের উপর সকাল এবং সন্ধ্যোয় আক্রমণ করছে।" তিনি আরও বললেন, "কেয়ামত এবং আমাকে পাঠানো হয়েছে সেই রুপভাবে।" অতঃপর তিনি তার প্রথম এবং মধ্যম আঙ্গুলি যুগল এক সাথে মিলিয়ে আরও বললেন, "সর্বোত্তম ভাষণ হোল আল্লাহর বই (কালাম), আর সর্বোত্তম পথপ্রদর্শন হোল মুহাম্মদ এর দেয়া পথ। আর সবচেয়ে মন্দ বিষয় হোল প্রবর্তিত নতুন বিদআত সমূহ; প্রত্যেক নতুন ধর্মীয় আবিষ্কার হোল ভুল।" তারপর তিনি বলতে লাগলেন, "একজন মুসলিমের কাছে আমি তার নিজের চেয়েও অধিক প্রিয়; এবং তার চেয়ে যে তার পরিবারের জন্য সম্পত্তি রেখে গেছে; এবং তার চেয়ে যে ঋণের বোঝা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সন্তানদের নিরুপায় অবস্থায় রেখে গেল। অতএব,*

তাদের দায়িত্ব (অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধের এবং সন্তানদের ভরণপোষণের) আমার ওপর।" (মুসলিম, Book #004, Hadith #1885)

আমাদের দেশে নানান রকম বিদআতের চর্চা আছে যা থেকে দূরে থাকা দরকার। যেমন ধরুন, কবর বা মাজার পূজা। আনেকেই পীর ফকীরকে ভক্তি করতে গিয়ে তাদের কাছে (অর্থাৎ কবরে) সরাসরি নানান রকম সাহায্য চেয়ে থাকে; এটা করতে গিয়ে তারা মৃত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ করে শীরক করে ফেলে; যা আল্লাহর দৃষ্টিতে এক জঘন্য এবং অমার্জনীয় অপরাধ। কোন কিছু দেয়ার যোগ্যতা বা এক্তিয়ার একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নাই; এ কথাটি পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে হবে। শীরক থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় আল্লাহর কাছে সরাসরি ক্ষমা চাওয়া। শীরক করে ক্ষমা না চেয়ে মৃত্যুবরণ করলে , আল্লাহ্ ঐ বাক্তিকে ক্ষমা করবেন না।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। (সূরা আন নিসা - ৪:৪৮)

অতএব, জীবিত থাকা কালেই অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আল্লাহ্র সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে সমকক্ষ ভাবাই হোল শীরক। অতএব সাবধান! কোরানের ১১২ নং সূরা এখলাছ এ আল্লাহতালা নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে -

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে করলে শীরকের আর আশঙ্কা থাকে না। অতএব, আমাদের সব সময় সেই চেষ্টাই করা উচিত। আল্লাহ্কে একক সত্তা বিশ্বাস করে ওনার সন্তুষ্টির জন্য এবাদত এবং জীবন নির্বাহ করলে উনি খুশি হন ;

যদি তারা ঈমান আনত এবং খোদাভীরু হত, তবে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত। (সূরা আল বাক্বারাহ – ২:১২৩)

২০১৪ সালের ৮-ই মার্চের প্রথম আলো পত্রিকায় নিম্নোক্ত খবরটি ছাপা হয়ঃ

মাজারপন্থীদের হামলায় তাবলিগের ২৫ জন আহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার চর ইসলামপুর গ্রামের নাজিরাবাড়ি মসজিদে মাজারপন্থী স্থানীয় কিছু লোকের হামলায় তাবলিগ-জামাতের ২৫ জন সদস্য আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

হামলার প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার শহরের লোকনাথ দীঘিরপাড় এলাকায় মিছিল ও সমাবেশ করেছেন স্থানীয় বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকেরা। চর ইসলামপুর গ্রামের তাবলিগ জামাতপন্থী এক যুবকের ফেসবুকের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

বিজয়নগর থানার ওসি রসুল আহমেদ নিজামী বলেন, চর ইসলামপুর গ্রামের মাজারপন্থীরা নাজিরাবাড়ি মসজিদে ঢুকে তাবলিগ জামাতপন্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। এতে এক মাদ্রাসাশিক্ষকসহ মাদ্রাসার ২৫ শিক্ষার্থী আহত হন। হামলার ঘটনায় কান্দিপাড়া জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার ছাত্র সাইফুল ইসলাম ১৬৬ জনের নামে মামলা করেছেন। এর মধ্যে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

মাজার পন্থিদের সমালোচনা করায় তবলিগ জামাতের সদস্যরা হেস্থ নেস্ত হন। অতএব, এখন থেকেই সতর্ক বাণী প্রচার না করলে অচিরেই অনেক লোক ভুল পথে থেকে যাবে।

আমাদের মধ্যে অনেকে ভণ্ড পীর এবং দরবেশের কাছে গিয়ে (না জেনে না বুঝে) তাবীয টোনা করে থাকে। এটা ইসলামে নিষিদ্ধ। ২০১১ এর জুলাই মাসে ঢাকায় আল-কাওসার ইন্সটিটিউট (যা কিনা মারসি মিশন ওয়ার্ড-এর একটি সংগঠন) এর একটি অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা ডঃ তাওফিক চৌধুরী অংশগ্রহণকারী কিছু দর্শক শ্রোতাদের কাছ থেকে কিছু তাবীয চেয়ে তা খুলে প্রমাণ করে দেন যে প্রত্যেকটি তাবীযেই যাদু মন্ত্রো১ সাথে জিন এবং শয়তানের নাম উল্লেখ করা আছে। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সব তাবীয পুড়িয়ে ফেলার অনুরোধ জানান, এবং বাড়িতে যার যা তাবীয আছে সব পুড়িয়ে ফেলতে বলেন। শত্রুর কু-যাদু টোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়াও শিখিয়ে দিয়েছেন তিনি সুরা ফালাক এবং সুরা নাস এর কথা উল্লেখ করে। এই অনুষ্ঠান থেকে দর্শকশ্রোতারা ভীষণ উপকৃত হয়েছেন। অতএব, আপনারা যারা এখনো তাবীয ব্যাবহার করেন, সে সব ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসুন এবং শুধু আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে শিখুন। যারা ইসলামের নামে, ইসলামের বেশ ধরে টাকা পয়সার বিনিময়ে তাবিজের ব্যবসা করেন, তারা ইসলামের শত্রু।

আমরা যখন যা চাবো সরাসরি আল্লাহর কাছে চাবো, আর কারো কাছে নয়। এতেই আল্লাহতালা খুশি হন। তিনি প্রতিদিন মাঝ রাতে (তাহাজ্জুদ থেকে ফজর ওয়াক্ত পর্যন্ত) সর্বনিম্ন আসমানে নেমে আসেন আমাদের দোয়া কবুল করার জন্য -

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বলেন, "প্রতিদিন শেষ তৃতীয়াংশ রাতের সময় আল্লাহতালা আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, "আমার কাছে কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করতে পারি? আমার কাছে কারো কি কোন চাওয়া আছে যা পুড়ন করতে পারি? আমার কাছে কি কেও মাফ চাওয়ার আছে যাকে আমি মাফ করতে পারি?" (বুখারি Book #21, Hadith #246, Book #75, Hadith #333, Book #93, Hadith #586 নং হাদিস)

অথচ আমরা বেশিরভাগই ঐ সময় ঘুমিয়ে কাটাই নামাজ (বা সালাত) না পড়ে। তিনি দেয়ার জন্য তৈরি অথচ আমরা কিছু চাইনা, চাই শুধু ভুল জায়গাতে যার দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। এজন্য আমরা কিছু পাইও না।

চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে -

হে মুমিন গন! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল বাক্বারাহ – ২:১৫৩)

আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাওয়ার কোন বিশেষ সময়ের প্রয়োজন হয়না। তবুও আমাদের উচিত হাদিস শাস্ত্রেউল্লেখিত বিশেষ সময়গুলোতে দোয়ার চেষ্টা করা কেননা ঐ সব সময়ের গুরত্তের কথা উল্লেখ করা আছে এবং দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অতএব, সেই বিশেষ ক্ষণগুলো জানতে হলে আমাদের বিস্তারিতভাবে হাদিস শাস্ত্র পড়তে হবে। অন্তর থেকে খাস নিয়তে অনাপত্তিকর কোন কিছু চাইলে তিনি সাধারণত মঞ্জুর করে থাকেন।

ঠিক সময়ে ঠিক নামাজ পড়তে হলে সন্যান্ন পরপরই রাতের খাওয়া শেষ করে এশার নামাজ পরে টিভি কম দেখে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে যাতে করে পরদিন সকাল চারটার দিকে সেট করা ঘড়ির এলার্ম শুনে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ না হোক অন্তত: ফজরের নামাজটা পড়া যায়। আগে ঘুমানোর অভ্যাস করলেই এটা সম্ভব হবে। বর্তমান যুগের ডাক্তাররা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে , রাত ১০ টার মধ্যে রাতের ঘুমের জন্য বিছানায় শুয়ে পড়তে পারলে পরদিন সকাল ৪ টায় ওঠা কঠিন কিছু নয়। আমি নিজেই এই অভ্যাসে এসে এই সুফল পাচ্ছি। অভ্যাসের পরিবর্তন করতে না পারলে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায়ের আলাদা ফজিলত আছে; অন্যথায় শাস্তি।

অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর; যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে (সূরা মাউন - ১০৭:৫)

দোয়ার ফল পেতে কোন কোন সময় কয়েক বছরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। আমরা অনেক কিছুই চাইতে পারি, কিন্তু সব কিছুই যে তিনি দেবেন তার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। কোন ফরিয়াদ যদি আমাদের জন্য ভাল না হয় তা কবুল হয়না। তবে তিনি আমাদের কোন চাওয়া বিফলে যেতেও দেন না। যে দোয়া কবুল হয়না, তার বদলে তিনি আমাদের জন্য নেকি রেখে দেন পরকালের পাল্লা ভারি করার জন্য যাতে আমরা উপকৃত হই। আমাদের আসল জয় পরকালের জয়ের ওপর। তাই আমাদের বেশি বেশি করে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া চাওয়া উচিত।

হযরত সালমান ফারসি (রা:) বর্ণনা করেছেন, "রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "আল্লাহতালা লজ্জাশীল ও দানশীল। যখন কোন বান্দা তার সামনে দুহাত পাতে তখন তাকে ব্যর্থ করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা অনুভব করেন তিনি।" (সুনান আবু দাউদ) [যাদে রাহ, পৃষ্ঠা ১৮৯]

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা মুসলমান এবং আমাদের জীবন প্রবাহ ভিন্ন। আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টানদের মত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে ওদের জীবন অনুসরণ করলে আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না। আল্লাহ্‌-তালা মুসলিমদের সব জাতির নেতা এবং আদর্শ জাতি হিসেবে মনোনীত করেছেন। সব জাতি আমাদের অনুসরণ করবে আমরা কারো অনুসরণ করব না - এটাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু, আমরা ঠিক উল্টোটাই করে বসে আছি। ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আমরা নিজেরা নিকৃষ্ট হয়ে বসে আছি । অতএব, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হলে অনুসরণ করতে হবে আমাদের নবীর (সা:) জীবন আচরণ ও আল্লাহর বিধান। ভুলে গেলে চলবে না যে, এই কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকেই অবহেলা বা জাহিলিয়া যুগের আরবরা একটি সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল । অতপর আজ আমাদের পরাজয় এবং অপদস্তের কারণই হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাহ বর্জন ।

যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:১২৪)

সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন: হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (সূরা ত্বোয়া-হা – ২০:১১৪)

অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (সূরা আল মু' মিনূন – ২৩:১১৬)

মানুষের অধিপতির,... (সূরা নাস – ১১৪:২)

মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (সূরা আল আহযাব – ৩৩:৪০)

আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের প্রভু এবং রাজা, আর মুহাম্মদ (সা:) হচ্ছেন আমাদের নবী এবং নেতা। সাহাবায়ে একরাম এবং আমাদের চার ইমাম [ইমাম আযম আবু হানিফা (৮০-১৫০ হিজরি), ইমাম মালিক (৯০-১৭৯ হিজরি), ইমাম শাফী (১৫০-২০৪ হিজরি), ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমেদ বিন মহাম্মেদ বিন হাম্বাল (১৬৪-২৪১ হিজরি)] সকলেই নবীর (সা:) অনুসারী ছিলেন। ওনারা যাকে অনুসরণ করেছেন, আমাদেরও উচিত তাকেই অনুসরণ করা, এবং সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। অনেকে মাজহাবের (অর্থ, চলার পথ) ওপর জোর দিয়ে থাকেন এবং সুন্নাহর প্রতি অবহেলা করেন । কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা নবীর উম্মত, কোন ইমামের বা মাজহাবের নয়। কোন মাজহাব যদি আমাদের উপর ফরজ হয়ে থাকে তা হবে সুন্নাহ মাজহাব যা কিনা ইসলাম। আমাদের নবী (সাঃ) পরিষ্কার বলে গেছেন -

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "আমার সব অনুসারী বেহেশ্তে প্রবেশ করবে শুধু তারা ছাড়া যারা আমাকে অস্বীকার করল।" লোকেরা জিজ্ঞেস করল, "ও আল্লাহ্‌র রাসুল! কারা আপনাকে অস্বীকার করবে?" তিনি বললেন, "যারা আমার কথা মানবে তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে; তারা ছাড়া, যারা আমার কথা মানবে না এবং অস্বীকার করবে।" (বুখারি, Book #92, Hadith #384)

স্বয়ং আল্লাহতায়ালাও আমাদের তাইই বলছেন -

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (সূরা আল ইমরান - ৩:৩১)

বস্তুতঃ কোন ইমাম কি বলল এবং কোন মাজহাবে কি লেখা আছে সেসব খবর আমাদের না রাখলেও চলবে। কেননা, নবী (সাঃ) এর পথের অনুসারীরাই জান্নাতবাসি হবে এটাই তো তিনি বলেছেন। উপরন্তু, নবীর সুন্নাহকে বাদ দিয়ে মাজহাবকে গুরুত্ব দিলে হাশরের ময়দানে নবী (সাঃ) আমাদের তার শাফায়েত থেকে বঞ্চিত করবেন। সেদিন ওনার শাফায়াতের একটি বড় বিষয় হল আল-কাওসারের পানি পান।

উসাইদ বিন হুদাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আনসারের মধ্য থেকে একজন লোক বলল, "ও আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি আমাকে নিয়োগ দেবেন যেমনটি আপনি অমুক এবং অমুককে দিয়েছেন? নবী বললেন, "আমার পরে আপনি দেখবেন অন্যদের পক্ষপাত করা হচ্ছে অপনার ওপরে; অতএব আমার সাথে ট্যাঁকে (অর্থাৎ, কাওসার হ্রদে; পুনরুত্থানের দিনে)। (বুখারি, Book #58, Hadith #136)

অর্থাৎ, সেই দিন, নবীর কাছ থেকে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কাওসার হ্রদের পানি পাওয়াটি হবে একটি বড় পাওয়া। এবার দেখা যাক, সেই হ্রদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তালা কোরআনে কি বলেছেন -

(হে নবী,) আমি অবশ্যই তোমাকে (নেয়ামতে পরিপূর্ণ) কাওসার দান করেছি; অতএব তোমার মালিককে স্মরণ করার জন্য তুমি নামায পড় এবং (তারই উদ্দেশে) তুমি কোরবানি করো; অবশ্যই (যে) তোমার নিন্দুক সেই হবে শেকড়-কাটা (অসহায়)। (সুরা আল কাওসার ১০৮: ১-৩)

সুরা আল কাওসার এর অনুবাদটি হাফেয মুনির উদ্দিন আহমদ এর "কুর'আনের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ" থেকে নেয়া; কেননা, বাংলা অনুবাদকেরা বিষয়টা ঠিক রাখলেও বেশীরভাগ ইংরেজি অনুবাদে "আল কাওসার" শব্দটিকে অনুবাদ করে "ফোয়ারা" বা "নদী" বা "হ্রদ" বা "কুয়া" করাতে তার নাম যে আল-কাউসার সেটাই হারিয়ে গেছে! সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এর সাথে সংযুক্ত সব হাদিস সমূহ। যেমন,

আবু উবাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আইশাকে (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম - "(হে নবী,)আমি অবশ্যই তোমাকে (নেয়ামতে পরিপূর্ণ) কাওসার দান করেছি..." । তিনি জবাবে বললেন, "কাওসার একটি নদী যেটা কিনা আপনার নবীকে দান করা হয়েছে, যে নদীর কূলে রয়েছে ফাঁকা মুক্তার তাঁবু যার ভেতরে বর্তন সমূহ তাঁরার মত অগণিত। " (বুখারি, Book #60, Hadith #489)

নবীজিকে বাদ দিয়ে যারা অন্য কাউকে অনুসরণ করে চলেছে তারা "হবে শেকড়-কাটা (অসহায়)" এবং কোন অবস্থাতেই তারা আল-কাওসারের কাছে যেতে পারবে না। আমাদের দেশের মুসলিমদের বেশীর ভাগই হানাফি মাজহাবের অনুসারী । অনেকে আবার জানেনও না যে তারা হানাফি দলভুক্ত, কেননা তাদের এটাও জানা নেই যে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে চারটি মাযহাবের প্রচলন আছে। কিন্তু, এই মাজহাবের নিয়ম কানুনের সাথে নবীর (সাঃ) নিয়মের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; শুধু শাফিই মাযহাব ছাড়া। এদের এক অনুসারির সাথে আলোচনায় জানতে পারলাম যে তারা মূলত নবীর সুন্নাহই অনুসরণ করে, যদিও তাদেরকে শাফিই মাযহাব অনুসারী ধরা হয়। ২০১৩ সালের ঈদ উল আযহা ছুটিতে মালায়শীয়া বেড়াতে গিয়ে দেখলাম যে সেখানকার মুসলমানরা শাফী মাজহাবের অনুসারী। মালায়রা খুবই নম্র ভদ্র ধার্মিক জাতি। ঐ দেশে এখনও সুখ শান্তি আছে। বুঝতে খুব বেশি বেগ পেতে হোল না যে তারা সুখী কেননা তারা কোরআন সুন্নাহ 'র সঠিক পথের অনুসারী; যে কারণে সে দেশে এখনও আল্লাহ্‌র রহমত বিরাজ করছে।

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম এর লেখা "মাযহাবীদের গুপ্তধন" পড়লে জানা যায় কিভাবে হানাফি মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে। অনুরূপ, মুফতী মাওলানা আব্দুর রউফ এর লেখা "হানাফী ফিকহের ইতিহাস ও পরিচয়" বইটিতে জানা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা ইমাম বুখারি এবং ইমাম মুসলিমের বহু আগের জমানার হলেও তিনি নিজে তার শিক্ষা এবং ধ্যান ধারণা সম্পর্কে কিছুই লিখে যান নি এবং তার কোন অনুসারীকেও লেখার অনুমতি দেন নি। ওসব লেখা থাকলে আজ আমদের উপকারে আসত। ইমাম আবু হানিফার নামে যে সব বই পত্র আজ আমরা দেখতে পাই সে সব বইপত্র লেখা হয়েছে তিনি মারা যাওয়ার ৩০০ থেকে ৪০০ বৎসর পর! ওনার নাম ব্যাবহার করে জাল ও মিথ্যা যোগ করে ওনার নামে "হানাফি মাজহাব" এর সৃষ্টি অনেক পরে। মূলত আরব বহির্ভূত দেশ গুলতেই হানাফি মাজহাবের অনুসারীদের দেখা যায় , কিন্তু আরব বিশ্বে হানাফি অনুসারীদের দেখা পাওয়া যায় না এবং কেও এই মাজহাবের কথা জানেও না। অতএব, "হানাফি মাজহাব" এর উৎপত্তি নবীর ও সাহাবা যুগের অনেক পরে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল , আমাদের

বর্তমান মাদ্রাসা লেখাপড়ার সিলেবাস এই হানাফি মাজহাবের উপর ভিত্তি করেই তৈরি যা কিনা একই অনুসারী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত। আমাদের সঠিক ইসলামে পরিচালিত হতে হলে অবশ্যই আমাদের সঠিক সিলেবাস তৈরি করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে শুরু করে প্রত্যেক মাদ্রাসায় এর প্রনয়ন দরকার। আমি বই দুইতির তথ্য নিচের ফর্দে যোগ করে দিলাম আপনাদের এ বিষয়ে আরও জানার জন্য।

আমার এক হানাফী মাজহাবের অনুসারী খালাত ভাই আমাকে একটি বই পড়তে দিল যার নাম, "তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ।" সংকলনেঃ মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী। লিসান্স - (হাদীস) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা শরীফ। মুহাদ্দিস, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা। ১৯তম সংস্করণ - নভেম্বর ২০১২। তত্তাবধানেঃ ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান। প্রথন প্রকাশঃ এপ্রিল ২০০৪। ১৯তম সঙ্কলনঃ নভেম্বর ২০১২। বইটি জনপ্রিয়তা দেখে যা কিনা পরপর আঁট বছরে উনিশবার প্রকাশ পেয়েছে, খুব আগ্রহ নিয়েই পড়তে শুরু করেছিলাম।

বোঝা গেল, ভদ্রলোক অনেক বই-পত্র পড়েছেন এবং পড়েন, কিন্তু তিনি ঠিকমত কোরআন ও হাদীস সমূহ পড়েছেন বলে মনে হয়না। কেননা, সমস্ত বই জুড়ে তিনি শুধু কে কি লিখেছেন ও বলেছেন তারই ফিরিস্তি এবং অভিযোগ; কোরআন ও হাদীসের আলোকে কোন কিছু খণ্ডাবার বা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা নেই। অথচ, ইসলামের মূল ভিত্তিই হোল কোরআন অর হাদীসের উপর, কে কি বলল বা লিখল তাতে কিছু যায় আসে না।

তার বইয়ের ৪৩ নং পৃষ্ঠায় সত্যিকার আহলে হাদীস কে? প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেনঃ "যুগযুগ ধরে হাদীস, উসুলে হাদীস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ এবং হাদীসের ব্যাখ্যা ও হাদীসের বর্ণনাকারীদের ইতিহাসের কিতাব সমুহের নিবেদিত এবং হাদীস শরীফের সংকলন, হিফাযত, সঠিক বুঝ এর অনুসরণ অনুকরণে নিজের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদেরকেই আহলে হাদীস বা আছাবুল হাদীস বলা হয়। চাই সে হানাফী হোক বা শাফীয়ী, মালেকী অথবা হাম্বলী... আহলে হাদীস হতে হলে হাদীস সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। ফিকহে হাদীস তথা হাদীসের মর্মকথা অনুধাবন করতে হবে, আর আমল করতে হবে সে অনুযায়ী। চাই সে যে মাযহাবেরই হোক না কেন।"

আবার ৪৮ থেকে ৫১ পৃষ্ঠায় সালাফী দাবির বাস্তবতা প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তিনি কিছু সহিহ হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ খেয়াল করলেন না যে সাহাবীদের সময় চার মাজহাব ছিলনা, ওনারা তখন শুধু রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসরণ করতেন।

৬৫ নং পৃষ্ঠায় তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বুখারি ও মুসলিম থেকে একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন , তো হোল, *"দ্বীন ও ধর্মের জ্ঞান আহরণ করা মানুষের পক্ষে যদি এত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে যে , আকাশের দুর্গম প্রান্ত বা সুরাইয়া তারকায় যেয়ে বিলুপ্ত হয়, তবুও পারস্যের এক ব্যাক্তি সেখান থেকে দ্বীন আহরণ করতে সক্ষম হবে।"*আর এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি শুধু ইয়াম হানীফা (রহঃ) কেই উপযুক্ত মনে করলেন যিনি কিনা একজন তাবেয়ী ছিলেন ; অর্থাৎ, তিনি কিছু সাহাবীদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। অতএব, তিনি সহিহ দ্বীন থেকে খুব বেশি দূরে ছিলেন না। তাছাড়া , যদিও তাকে পারস্যের ধরা হয়, মুলত তার জন্ম হয়েছিল ইরাকের কুফাতে। বংশপরম্পরায় তাকে পারস্যের ধরা হলেও, তার বাবা মুলত কাবুল , আফগানিস্তানের ছিলেন কিন্তু ব্যবসা করতেন পারস্যে। অতএব, তাকে পারস্যের মনে করার যুক্তি দুর্বল।

ইমাম হানীফার চেয়ে আরও বেশি উপযুক্ত ব্যাক্তিত্ব হলেন ইমাম বুখারি (রহঃ) কেননা তার জন্ম ছিল পারস্যের খোরাসানে এবং তিনি সেই সুরাইয়া তারার মতই দূরবর্তী একজন লোক যিনি এক কঠিন কাজ সম্পাদন করেছেন তার বুখারি শরিফ সঙ্কলনের মাধ্যমে। অন্যদিকে, ইমাম হানীফা (রহঃ) কোন হাদিসই সংকলন করে যান নি। থাকলে ওনারটাই প্রাধান্য পেত বেশি। অথচ ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় তিনি একজনের সুত্র ধরে উল্লেখ করেছেন যে ইমাম আবু হানীফার হাদীস সমূহ সহিহ সিত্তার চেয়েও সহিহ ! তাই-ই হোত, যদি কিনা তিনি কিছু লিখে যেতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবসত তিনি কিছু লিখে না গেলেও , তার অনুসারীরা তার মৃত্যুর ৩০০ বৎসর পর তার নামে কিছে বই পত্তর লিখেছেন। এবং হানাফী অনুসারীরা দাবী করছেন সেগুলো সহিহ ; যদিও ইমাম আবু হানীফা এসবের কিছুই জানেন না। ব্যাপারটা এমন যে , কেও একজন আমার নাম দিয়ে একটি বই লিখল যা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না ; আমি কি সে বই আমার বলে দাবী করতে পারি?

অধ্যায় শেষে তিনি একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ এর কথাও উল্লেখ করেছেন কিন্তু তা মোকাবেলা করা হয়েছে কিনা তো আর উল্লেখ করেননি। লেখক ওনার আকীদার বা বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ করেছেন ৮৬ পৃষ্ঠার পর্যালোচনা পর্যায়ে যা আমার বিবেচনায় বইটির আসল বিষয়বস্তু। তার নিম্নের উক্তি থেকে আমরা তার আকীদার পরিচয় পাই, "সহিহ সিত্তাহ বিশেষ করে বুখারী ও মুসলিম শরীফই শুধু বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব নয়। সহিহ

সিত্তাহ বা বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অপর কোন কিতাবে সহিহ হাদীস নেই একথা কোন হাদীসে নেই। এমনকি বুখারী মুসলিমের হাদীস হোলেই সহিহ হবে একথাও কোন হাদীসে নেই। বরং সহিহ সিত্তাহ ছাড়াও ইমাম আবু আব্দিল্লাহ হাকেমের কিতাব "মুস্তাদরাক", ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযাইমার কিতাব "সহিহ" এবং ইমাম জিয়াউদ্দীন আল মাকদাসীর কিতাব "আল মুকতারাহ", মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে অসংখ্য সহিহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এভাবে হাদীসের জগতে রচিত সর্বপ্রথম কিতাব, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) প্রণীত "কিতাবুল আসার" এবং তার হাদীস সংকলিত ১৫টি "মাসানিদ" বা হাদীস গ্রন্থেও অসংখ্য সহিহ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে অনেকগুলো এমন যে বুখারী মুসলিম ও সহিহ সিত্তাহর কোন কিতাবে আদৌ উল্লেখ নেই। আর কিছু এমনও পাওয়া যায় যা বুখারী মুসলিমের কোন কোন হাদীস অপেক্ষা শক্তিশালী ও সহিহ এবং তুলনামূলক উচ্চ তথা এক বা দুই রাবী 'র মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ..."।

পরিষ্কার হয়ে গেল যে, উনি বুখারি ও মুসলিম শরীফকে সহিহ মনে করন না। অথচ , তিনি নাকি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এর হাদীস বিভাগে আধায়্যন করেছেন। সেখানে একাডেমীক খাতিরে সব মাজহাবের আকীদার কথা আলোচনা করা হয় এবং ইমাম আবু হানীফাকে একজন শীর্ষ ইমাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাথে সাথে এও স্বীকার করা হয় যে, তিনি কিছু লিখে যান নি। যা কিছু লিখা হয়েছে ওনার নামে , তো হয়েছে ওনার ছাত্র আবু ইয়ুসুফ দ্বারা যে কিনা তার উস্তাদকে অবজ্ঞা করে তখনকার আব্বাসীয় রাজ্যের প্রধান বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন, যা কিনা তার শিক্ষক আবু হানীফা তার পূর্বে নিজেকে ঐ পদের অযোগ্য বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করেন এবং যার পরিণতিতে তাকে কারাজীবন ও শাস্তি ভোগ করতে হয়। অবশেষে আবু হানীফা হাজতেই মৃত্যুবরণ করেন এবং তার সেই ছাত্র তাকে সাহায্য করার কোন প্রচেষ্টাই চালায়নি।

আমার মনে হয়, আবু হানীফার অনুসারীরা ওনার সম্পর্কে কোন পড়ালেখা করেন না। উনি একজন বিজ্ঞ এবং সম্মানিত মুসলিম ব্যাক্তিত্ব ছিলেন। ওনার অনেক অনুসারীও ছিল, যার কারণে ওনার জানাজায় ৫০,০০০ এরও বেশি লোকের সমাগম হয়। আবু ইয়ুসুফ যা লিখেছে তো তার নিজের , আবু হানীফার নয়। অতএব, আজ যারা আবু হানীফার অনুসারী বলে দাবী করেন , তারা মুলত আবু ইয়ুসুফের অনুসারী। আবু ইয়ুসুফ নিজেকে শুধু প্রধান বিচারক পদের উপজুক্তই মনে করেন নি , তিনি তার উস্তাদের আদেশ উপেক্ষা করে ওনার নাম দিয়ে বইপত্রও লিখেছেন যার থেকে কিছু নেয়ার মনমানসিকতা পরবর্তীকালের হাদীস সংকলকদের ছিল না। যার কারণে, কোথাও আবু হানীফার বা আবু

ইয়ুসুফের উধ্রিত কোন হাদীসও কোথাও পাওয়া যায় না। আমিও মনে করি ঐ বিশ্বাসঘাতক ছাত্রের কাছ থেকে আমাদের কিছুই শেখার নেই।

৭৪ নং পৃষ্ঠায় তিনি পাঠকদের বিভিন্ন লেখকের বই পত্র পড়ার আহ্বান করেছেন , অথচ ইসলামের আসল বই কোরআন ও হাদীস পড়ার ব্যাপারে বইয়ের কোথাও কোন উল্লেখ ও উৎসাহ নেই।

৭৮ নং পৃষ্ঠায় তিনি তবলীগ জামাতের সাফাই গাইতে গিয়ে কোরআনের সূরা ফুসিলাত এর ৩৩ নং আয়াত এবং সূরা মাইদাহ এর ৬৭ নং আয়াতের উল্লেখ করেছেন। ভাব খানা এমন যে তবলীগ জামাত ছাড়া আর কেউই যেন ইসলামের দাওয়াত দেয় না। তবে তিনি ৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি শেষ করেছেন।

বইটি পড়া শেষ করে আমার মনে হয়েছে যে তিনি “মুহাম্মাদী” বা “সালাফী” বা “আহলে হাদীস” বা “লা মাজহাব” এর লোকজন দ্বারা হেস্তনেস্ত হয়েছেন বা হোতেন যার কারণে তার বই জুড়ে শুধু তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে আমার তার প্রতি সহানুভূতি রইল; কেননা, কাউকে হেস্ত নেস্ত করা কোন শিক্ষিত মুসলমানের কাজ নয়। আমরা অনেকেই ভুল ভ্রান্তির মধ্যে থাকতে পারি, এবং আমাদের উচিত ধৈর্য ও শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাপ্তি করা। কাউকে ছোট করলে কোন সমাধান হবে না।

আমি যখন বইটি পড়া শেষ করে সেটা আমার খালাত ভাইকে ফেরত দিতে যাই, তখন সে আমাকে আরেকটি বই পড়তে দেয়, এবং সেটি হল - “কুরআন হাদীসের অপব্যখ্যাকারী ইসলামী আহকামের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানকারী ডঃ জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ।“ সংকলন ও সম্পাদনাঃ মুফতী মীজানুর রহমান কাশেমী। জামিয়া রহমানিয়া। সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

[[বইটি মূলত ডঃ জাকির নায়েকের সমালোচনা। লেখক ডঃ জাকির নায়েকের পরিচয় দিয়ে বইটি শুরু করেন, তার পর শুরু হয় তার ভুল ত্রুটি নিয়ে আলোচনা; অর্থাৎ, গীবত বা পরনিন্দা। অথচ, গীবত সম্পর্কে আল্লাহ্ কোরআনে কি বলেছেন?

> *মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা*

না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা আল হুজরাত - ৪৯:১২)]]

কথাটি পুরোপুরি মিথ্যে নয় যে ডঃ জাকির নায়েক মাঝে মধ্যে অনেক বিষয়ে তার মনগড়া বিশ্লেষণ এবং উদাহরণ দেন শ্রোতাদের বোঝার সুবিধার জন্য। শুধু তিনিই নন, অনেকেই দেন। লেখক নিজেও দিয়েছেন কয়েক যায়গায়। মরহুম আহমেদ দীদাত এর ভক্ত ও অনুসারী হিসেবে তিনি তুলনামূলক ধর্ম নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, পরবর্তীতে তিনি মুসলিমদেরও হেদায়েত করতে আরম্ভ করেন, যা আহমেদ দীদাত করতেন না এবং খুব সুকৌশলে ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রশ্নগুল এড়িয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, "ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়ে আমি পারদর্শী নই; অতএব, ওসব বিষয় কোন ইমাম বা মওলানার কাছ থেকে জেনে নিন।"

প্রত্যেক ইসলাম চর্চাকারী মুসলমানই কম বেশী একজন ধর্ম প্রচারক। ডঃ নায়েক একটু ব্যাতিক্রম কেননা তিনি ধর্ম প্রচারকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। যার কারণে তাকে পড়ালেখাও করতে হয় অনেক বেশী। শুধু যে ধর্ম বিষয়ক বই পুস্তক তা নয়, দ্বীন দুনিয়ার অনেক খবরই তাকে রাখতে হয়। যা আমরা অনেকেই করি না। তিনি কোন মাদ্রাসাতে পড়ালেখা করেননি ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজে নিজে সরাসরি কোরআন ও হাদিস থেকে ভেজাল বিহীন ইসলাম শিখেছেন এবং চর্চা করেন। তিনি কোন মাজহাবের অনুসারী নন বলে তাকে "লা-মাজহাবী" অর্থাৎ, "মাজহাব ছাড়া" বলা হয়। তিনি দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টাই লেখাপড়া ও গবেষণায় কাটান। তার বিশাল এক গ্রন্থাগার রয়েছে যেখানে অনেক ধরনের বই পুস্তকে পরিপূর্ণ যেখানে তিনি গভির রাত পর্যন্ত পড়ালেখায় ও গবেষণায় মগ্ন থাকেন। অন্যান্য অনেক জ্ঞানী আলেম ও মনীষীদের মত তিনিও আরবী ভাষা জানেন না। লেখক নিজেও জানান কিনা তো সম্পর্কে কিছু লেখেননি। কিন্তু তার (অর্থাৎ, ডঃ নায়েক) স্মৃতি শক্তি অসাধারণ। আমার তো মনে হয় তিনি চাইলে সহজেই কোরআন হেফয করতে পারবেন যেমনটি মাদরাসার ছাত্ররা করে। তিনি মাদ্রাসায় না গিয়ে একজন ইসলামী স্কলার হয়েছেন বলে লেখক তাকে ঠাট্টা করেছেন। অথচ, অনেকেই মাদ্রাসায় না গিয়ে স্কলার হয়েছেন এবং হন। একজন স্কলার হতে লাগে জ্ঞান ও গরীমা; তার সবই আছে। তার প্রচেষ্টায় হাজার হাজার মানুষ ইসলামের দিশারী পেয়েছেন। লেখক কজনকে ইসলামের পথে এনেছেন তার কোন উল্লেখ নেই।

জাকির নায়েক শুধু একজন ডাক্তারই নন, তিনি জ্ঞানের ভাঁড়ে একজন ইসলামী ডক্টরেটও। তিনি কোরআন ও হাদিসের উক্তি ও উদাহরন ছাড়া কোন মতামত দেন না। আল্লাহতালা যাকে খুশি জ্ঞান দান করেন, ইসলামী জ্ঞানের জন্য মাদ্রাসায় (যার অর্থ মূলত স্কুল) পড়া বা কোন আলামের সাথে থেকে ইসলাম শেখা আবশ্যকীয় নয়,

> *তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:২৬৯)*

তিনি যেভাবে কোরআনের আয়াত ও সুরার নম্বর এবং হাদীসের সুত্র নম্বর, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সহ মুখস্ত উল্লেখ করেন, লেখক তার লেখনীতেও তা করতে পারেন নি, বক্তিতায় তো দুরের কথা। এবার আসুন আমরা লেখকের আপত্তিগুলো সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করি।

১ম অভিযোগঃ মাসিক চলাকালীন মহিলাদের কোরআন তেলাওয়াত করা প্রসঙ্গে তিনি বুখারী ও মুসলিমের নাম দিয়ে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন কিন্তু তা কত নম্বর হাদিস এবং কোন খণ্ডে থেকে নেয়া তার কোন উল্লেখ নেই। তা হোল, ***"হায়েজা মহিলা এবং নাপাক ব্যক্তি যেন কোরআন না পড়ে।"*** আমি বুখারী ও মুসলিমে এটা খুঁজে পাইনি। যা পেয়েছি তা হোলঃ

> *আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) আমি মাসিক থাকা অবস্থায় আমার উরুর উপর হেলান দিয়ে শুয়ে কোরআন দেলাওাত করতেন। (মুসলিম, Book #003, Hadith #0591)*

বোঝা যাচ্ছে, ঋতু বা মাসিক অবস্থায় মহিলাদের কোরআন তেলাওয়াত শুনতে কোন বাধা নেই। অতএব, তেলাওয়াত করতেও কোন বাধা থাকার কথা নয়। "নাপাক" শব্দের অর্থ পাক নয় বা অপরিষ্কার বা অপরিছন্ন। ওজু না করেও পাক পবিত্র থাকা যায়। গোসলেও পাক হয়।

> *আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) আমাকে আদেশ করলেন আমি যেন মসজিদে গিয়ে ওনার জন্য মাদুরটি নিয়ে আসি। আমি ওনাকে জানালাম যে আমি মাসিক অবস্থায় আছি। তিনি বললেন, "অমাকে ওটা এনে দাও, কেননা তোমার মাসিক তোমার হাতের মধ্যে নেই।" (মুসলিম, Book #003, Hadith #0588)*

অতএব বোঝা যাচ্ছে, ঋতু অবস্থায় কোন বস্তু ধরায় বা ছোঁয়ায়ও কোন বাধা নেই এমনকি মসজিদে ঢুকতেও কোন নিষেধ নেই। মাসিক চলা কালে শুধু সহমিলন, সালাত, সিয়াম ও হজ্জে নিষেধ আছে। সালাতে যেহেতু নিজেকে পরিষ্কার পরিছন্ন ভাবে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে হয়, এবং গোসল বা অজুতেও ঋতুর অপবিত্রতা যায়না; সেহেতু তা নিষেধ আছে। রক্তক্ষরণে যেহেতু শরীর দুর্বল থাকে সেহেতু সিয়াম ও হাজ্জ থেকেও তারা মুক্ত।

কোরআন যখন নাজেল হত, তখন রাসুল (সাঃ) এবং সাহাবীরা সবসময় ওজু অবস্থায় থাকতেন না। ওজুর আবশ্যকতা শুধু সালাতের ব্যাপারেই, অন্য কিছুতে নয়। কোরআন তেলাওয়াত একটি উল্লেখযোগ্য এবাদত হওয়া সত্ত্বেও কোন হাদীসে কোরআন ধরা বা পড়ার আগে কোন ওজুর তাগীদ নেই। নিম্নের হাদীসে তাই দেখা যায়ঃ

> *আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি একবার নবীর (সাঃ) স্ত্রী এবং ওনার চাচী মাইমুনার ঘরে এক রাত ছিলেন। তিনি বললেন, "আমি বিছানায় অনুপ্রস্থ অবস্থায় এবং রাসুল (সাঃ) এবং ওনার স্ত্রী কুশনে লম্বালম্বিভাবে শুয়ে ছিলেন। আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) মধ্যরাত পর্যন্ত বা তার কিছু আগেপরে ঘুমিয়ে উঠলেন তার হাত দিয়ে চেহারার ঘুমের চিহ্ন মুছতে মুছতে। তারপর সূরা আল-ইমরানের শেষ ১০ আয়াত তেলাওয়াত করে তিনি ঝুলন্ত জল ত্বকের দিকে গেলেন। নিখুঁত ভাবে ওজু করার পর তিনি সালাত পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। আমিও উঠে গেলাম এবং নবীকে (সাঃ) অনুকরণ করলাম ও ওনার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। উনি ওনার ডান হাত আমার মাথায় রাখলেন এবং আমার ডান কানে মোচড় দিলেন। তিনি দুই রাকাত করে করে ছয়বার সালাত পড়ে শেষে এক রাকাত বেতের আদায় করলেন। এর পর তিনি আবার শুয়ে পরলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না মুয়াজ্জিনের ডাক আসলো; অতঃপর তিনি উঠে গিয়ে দুই হালকা রাকাত সালাত আদায় করে ফজরের সালাতে ইমামতি করতে বের হয়ে গেলেন। (বুখারি, Book #4, Hadith #183)*

দেখা যাচ্ছে রাসুল (সাঃ) ওজু না করেও কোরআনের আয়াত তেলাওয়াৎ করতেন। উল্লেখ্য যে, নবীর (সাঃ) জামানায় কোরআন বই আকারে ছিল না। তখন সকলেই যখন তখন মুখস্থ কোরআন পড়ত বা তেলাওয়াত করতো এবং একে অন্যকে শেখাত। কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী। তিনি এই কিতাব আমাদের শুধু তোতা পাখির মত মুখস্ত তেলাওয়াত

করার জন্য দেন নি, বরং তো পড়ে বুঝে আমল করার জন্যই দিয়েছেন এবং সংরক্ষণ করছেন।

ওজুর ব্যাপারে আরেকটি হাদিস পাওয়া যায়, তা হলঃ

> *আল-বারা'ব আজীব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা ঘুমাতে যাওয়ার আগে সালাতের আগে যেভাবে ওজু করা হয় সেভাবে ওজু করে ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়, "ও আল্লাহ্‌, আমি আপনার দিকে মুখ ফেরালাম এবং আমার সর্ব বিষয় আপনার উপর ছেড়ে দিলাম। আমি আপনার ফিরে এলাম আপনার নিরাপত্তার জন্য আশা ও ভয় নিয়ে। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই এবং বিপদ আপদ থেকে উদ্ধারকর্তা নেই। আমি আপনার নাজেলকৃত কিতাব ও আপনার প্রেরিত রাসুল (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনলাম।" ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই বাক্যগুলো যেন তোমার শেষ বাক্য হয় যদি তুমি সেরাতে ঘুমে মারা যাও, যেন ইসলামের মধ্যে তোমার মৃত্যু গণ্য হয়।" আমি বাক্যগুলো মুখস্ত করার জন্য বার বার পড়তে লাগলাম এবং বললাম, "আমি আল্লহার প্রেরিত রাসুল (সাঃ) এর উপর ঈমান স্থাপন করলাম।" তিনি বললেন, "বলো, "আমি আল্লহার প্রেরিত নবী বা দূত (সাঃ) এর উপর ঈমান স্থাপন করলাম।" (মুসলিম, Book #035, Hadith #6544)*

কোন কোন ক্ষেত্রে, ওজু থাকলে বা রাখতে পারলে ভাল, কিন্তু না থাকলেও চলে। কেননা, রাসুল (সাঃ) কোন কোন সময় ওজু ছাড়াই থাকতেনঃ

> *আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) প্রস্রাব করা কালে উমার (রাঃ) তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন হাতে এক জগ পানি নিয়ে। নবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি উমার?" উমার (রাঃ) বললেন, "আপানার ওজুর পানি।" নবী (সাঃ) বললেন, "প্রতিবার প্রস্রাব করার পর ওজু করার আদেশ আমাকে দেয়া হয়নি। আমি যদি তা করি, তাহলে এটা সুন্নায় পরিণত হবে।" (আবু দাউদ, Book #1, Hadith #0042)*

তবে ওজু থাকলে কোন রকম দ্বিধা ও সংশয় থাকে না। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে ডঃ নায়েক ভুল কিছু বলেন নি। লেখক যদি দেখাতে পারেন কিসের উপর ভিত্তি করে তার মাজহাব ওনার পরিবেশিত ফাতওয়া বা ইজমা বা কিয়াস দিলেন তাহলে আমরা তা যাচাই

করে দেখতাম। কেননা, কারো কথার অপর ভিত্তি করে অনেক কাজ হয়ত করা চলে, কিন্তু ধর্ম চলে না। ধর্ম পালনের জন্য চাই কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক বিশ্বস্ত দলিল ও প্রমাণ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোন তরীকা বা মাজহাব অনুসরণ করলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়না। যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সহিহ সুন্নাহ বা হাদিস অবজ্ঞা করে সে বিপদের মধ্যে আছে। রাসুল (সাঃ) আমাদের ধর্মীয় পিতা ও শিক্ষক, মুসলমান হিসেবে আমাদের সরাসরি অনাকেই অনুসরণ করতে হবে আর কাউকে নয়।

২য় অভিযোগঃ মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গে ডঃ নায়েক বেশ কটি হাদীস উল্লেখ সত্ত্বেও লেখক তা গ্রহণ করতে নারাজ। তিনি নবী (সাঃ) হাদীসের চেয়ে আম্বিয়ায়ে কেরামদের মতামতের গুরুত্ব দেন বেশী! তিনি উমর (রাঃ) এর সময়ের এক পরিস্থিতির উল্লেখ করেন যখন নিরাপত্তার বিবেচনায় তিনি মুসলিম নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ নয় বরং নিরুৎসাহ করেন। সে সময় নারীদের নিরাপত্তা বা পরিস্থিতি এতই নাজুক হয়ে পড়ে যে, আয়শা (রাঃ) ও ভেবেছিলেন যে নবী (সাঃ) জিবিত থাকলে হয়ত তিনিও তাই করতেন। [(বুখারী, Book #12, Hadith #828)]। অতএব, আজও যদি তেমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, আমাদেরও তাইই করা উচিত। তবে নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ নেই, নিম্নের উমর (রাঃ) এরই অন্য একটি হাদীসটি তা প্রমাণ করেঃ

> *ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ উমার বিন আল-খাত্তাব (রাঃ) এর একজন স্ত্রী ফজর ও এশার সালাত মসজিদে জামাতে আদায় করতেন। ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল কেন তিনি আত্মমর্যাদাশীল উমারের (রাঃ) অপছন্দ সত্ত্বেও ঘড়ের বিইরে আসেন; তিনি জবাব দিলেন, "কি ওনাকে আমার এই কাজ থেকে বিরত রাখায় বাধা দিচ্ছে?" অন্যজন জবাব দিল, "আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) এর "আল্লাহ্‌র ক্রীতদাসীকে আল্লাহ্‌র মসজিদে যেতে বাধা দিও না" বাণীটি তাকে বাধা দেয়।" (বুখারি, Book #13, Hadith #23)*

৩য় অভিযোগঃ জুমার খুতবা আরবীতে জরুরী নয় প্রসঙ্গে ডঃ নায়েকের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক "নিশ্চয় জুমার খুৎবাকে দুই রাকাতের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে" হাদিসটিকে তার সপক্ষে দলিল হিসেবে ব্যাবহার করেছেন; যেখানে তিনি যুক্তি দাঁড় করালেন যে যেহেতু নামায আরবীতে পড়া হয় বা পড়তে হয়, খুৎবাও আরবীতেই পড়তে হবে। অথচ, খুৎবা অর্থ হল "ধর্মীয় আলোচনা"; এবং যে কোন আলোচনাই হোক তা করা হয় বোঝার জন্য। যদি কোন আলোচনা বিদেশী ভাষায় করা হয় যা কেউ না বোঝে সেই আলোচনায় কোন ফায়দা আছে কি? তার যুক্তি মেনে নিলে আমাদের সালাতও

কবুল হয়না, কেননা আমরা সালাতে আরবীতে কি পড়ছি তার কিছুই বুঝি না! এবং বস্তুতই তাই! আমরা আরবী না জানার কারণে আমরা সালাতে পড়া সুরার কিছুই বুঝিনা, এবং এই না বুঝার কারণে আমাদের সালাত কবুল হয়না। দেখুন আল্লাহতালা কোরানে কি বলছেন,

> *এভাবেই আল্লাহ তা' আলা তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পার। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:২৪২)*

> *হে ঈমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে যেও না) ফরয গোসলের আবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-তাতে মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা ' আলা ক্ষমাশীল। (সূরা আন নিসা - ৪:৪৩)*

দেখা যাচ্ছে, আল্লাহতালা কোরআনের আয়াত সমূহ আমাদের জন্য সহজ ও সরল করে দিয়েছেন যাতে করে আমরা তার বাণী বুঝতে পারি। মদ্যপ আবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন কেননা ঐ অবস্থায় আমাদের বোধ শক্তি কাজ করেনা, যে কারণে আমরা কি পড়ছি বা বলছি তা বুঝতে পারিনা, অর্থাৎ, সালাতে মনোযোগ থাকে না। এখানে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সালাত বুঝে পড়াতে। কোরআনের বাণী পড়ে বুঝতে না পারলে কোন উপকার নেই। কেননা সেই পড়া থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করা বা আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ পালন করা সম্ভব নয়। অথচ আমাদের দেশের ১০০% ভাগ মুসলমানই শুধু শুনে মুসলিম, বুঝে নয়। আমাদের সালাত কি কবুল হচ্ছে? লেখক এ বিষয়ে কি বোলবেন? তার ইযমা, কিয়াস বা মাজহাবে এ বিষয়ে কোন জবাব আছে কি?

৪র্থ অভিযোগঃ তারাবীহ নামাযের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি আবারও তারাবী আঁট রাকাত বিষয়ক বহু হাদীস অস্বীকার করলেন, এবং দাবী করেলেন যে আমাদের রাসুল (সাঃ) নাকি বিশ রাকাত সালাত পড়তেন; অথচ, কোন দলিল পেশ করলেন না। অথচ, তারাবীতে বিশ রাকাত সালাতের প্রচলন ইসলামের ইতিহাসের অনেক পরে পাওয়া যায়। আমি এবিষয়ে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লিখেছি যা আপনারা পড়ে দেখতে পারেনঃ

"Taraweeh (or Tarawih) vs Tahajjud: Ending the debate" - http://javedahmad.tripod.com/islam/taraweeh.htm

৫ম অভিযোগঃ কাঁকড়া - কচ্ছপ হালাল বা হারামের এর বিষয়ে তিনি কোন দলিল না দিয়েই বিষয়টিকে উদ্ভট আখ্যা দিলেন। অথচ, কাঁকড়া আর চিংড়ী একই জাতের প্রাণী। যদি চিংড়ী খাওয়া হালাল হয়, কাঁকড়া কেন না? অহিংস্র প্রাণী হিসেবে কচ্ছপ কেন হালাল হবে না? দেখা যাচ্ছে হারাম ও হারাম প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত সমূহ তার অজানা। এই আয়াত গুলো দেখে নিনঃ (আল-মায়দা, সূরা #৫, আয়াত #৩-৫); (আল-মুমেনুন, সূরা #২৩, আয়াত #৫১)।

শুধু প্রথম অধ্যায়টি ওনার নিজের। বাকী অধ্যায়গুলো অন্যদের লেখার আনুবাদ। যারা অনেকটা ওনার সুরেই বলেছেন যা পড়লে বোঝা যায় যে ওনারা ওনাদের চিরাচরিত ইসলামী গতিধারায় পার্থক্য অনুভব করাতেই আতংক অনুভব করছেন। আমার ধারনা, ভারতীয় উপমহাদেশের (অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তরীকা, মাজহাব, মতভেদ, দলমত থাকাতে ডঃ নায়েক ইসলামের বিষয়ে দিলিল সহকারে তার মতামত পেশ করেন যাতে করে মুসলমানরা নিজেরা কোরআন ও হাদীস পড়তে আগ্রহী হয় এবং নিজেদের সব ভুলভ্রান্তি ও বিদআত থেকে মক্ত করতে পারে।

[[এই বইয়ে সংযোজিত মুফতী মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী রচিত "কে এই যাকির নায়েক? কী তার মিশন?" লেখার ১১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ কোরেছেনঃ

> *"...এছাড়াও তার লেকচার ও বক্তৃতার একটি ভয়ানক বিষয় এও পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি কুরানী আয়াতের সংখ্যা, সূরা সমুহের সংখ্যা, রুকুর নম্বর ইত্যাদি সংখ্যাগুলিকে নিজের মনমত যোগ-বিয়োগ, গুন-ভাগ দিয়ে একটা আজীব গরীব ফলাফল দর্শকের সামনে তুলে ধরেন। দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের নিকট এটা বহুত বড় বিস্ময়কর ব্যাপার হলেও দীনের সঠিক বুঝ যারা রাখে তাদের নিকট এটা নিছক বালখিতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা আয়াত সমুহের এই নাম্বারিং , পারার বিন্যাস, সূরা এবং পারার হিসাব রুকুর বিন্যাস এসব রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পরে হয়েছে। পাঠকদের আসানীর প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব করা হয়েছে। এখন সেগুলির সংখ্যা এবং নম্বরকে উলটপালট করে কোন ফলাফল যদি বের করা হয় তাহলে সেটা হবে কোরআনের সাথে একটা তামাশা। যা শুধুমাত্র জাকির নায়েক*

এবং তার চিন্তাধারার লোকদের উল্টা চিন্তার ফসল। এবং তাদের অদূরদর্শিতার স্পষ্ট প্রমাণ। কেননা কোরআন কোন হিসাব বিজ্ঞান অনুশারে নাযিল হয় নি ...”

ডঃ রাশাদ খালিফা তার “কোরআনের গাণিতিক বিস্ময়” গবেষণার মাধ্যমে সংখ্যাতত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করলে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন এবং তার গবেষণা সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়। সেই অনুপ্রেরনার সুত্রেই ডঃ জাকির নায়েকও মাঝে মধ্যে কিছু সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা নিয়ে আসেন, এবং তাতে তার আলোচনা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু শুধু তিনিই নন, নউমান আলী খানও এধরনের বিষয় (যেমনঃ বর্ণতত্ত্ব) নিয়ে আলোচনা করেন যিনি কিনা ডঃ নায়েক থেকেও একজন জাদ্রেল ইসলামিক স্কলার। তার তেমন একটি ভিডিও “পবিত্র কুরআন গতিময় বা গতিসম্পর্কিত লেখনী এর ৩০ অপূর্বসুন্দর উজ্জ্বল বিস্ময়” আপনারা ইউ-টিউব এ দেখতে পারেন।

মুফতী মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী ঠিকই বলেছেন যে , কোরআন বিক্ষিপ্তভাবে দীর্ঘ সময় ধরে নাজেল হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে তিনি হয়ত জানেন না যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জীবিত থাকতেই কোরআনর সন্নিবেশন ব্যাবস্থা করা হয় এবং লিপিবদ্ধও করা হয়; যা পরবর্তীকালে আবু বকর (রাহঃ) সময় মুদ্রন আকারে কোরআনের বেশ কিছু কপি লেখা হয় এবং সেগুলো বিভিন্ন প্রদেশের আমীরদের কাছে পাঠানো হয়।]]

ইসলাম কারো বাপ দাদার সম্পত্তি নয়। যে যার যার জ্ঞান বিবেচনায় তা প্রচার ও প্রসার করার প্রয়াস পান। দায়িত্ব হচ্ছে শ্রোতার যেন তিনি যা শুনছেন তা যাচাই বাছাই করে নেন কোরআন ও হাদিসের আলোকে। অন্ধ বিশ্বাস করে ঠোকে যাবার সম্ভাবনা আছে। যে যাই বলুক বা করুক, আমাদের আকীদার জবাব আমাদের নিজেদেরই দিতে হবে। কোন ইমাম যদি ভুল মাসালা দেন এবং তা যদি যাচাই না করে কেও যদি আমল করেন, তার জন্য উভয়ই দ্বায়ী। প্রমাণ ছাড়া ধর্মের বিষয়ে কোন তথ্য পরিবেশন করার অধিকার আমাদের কারো নেই। যারা চার মাজহাবের যেকোনো একটি অনুসরণ করা অপরিহার্য বলে দাবী করেন, তাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, নবীর (সাঃ) যুগে কোন মাজহাব ছিলনা, ছিল শুধু ওনার সুন্নাহ। রাসুল (সাঃ) এর সাহাবীরা এবং পরবর্তী সময়ের তাবেঈনরাও সুন্নাহ অনুসরণ করতেন এমনকি চার মাজহাবের ইমামরাও! তাহলে কিভাবে বা কারা এইসব School of thoughts বা মাজহাবের সুত্রপাত ঘটাল?

"পড় তোমার প্রভুর নামে..." (আল-আলাক, সূরা #৯৬, আয়াত #১) আদেশ দিয়ে কোরআন যখন প্রথম নাজেল হয়, সেই আদেশ শুধু আমাদের নবীর (সাঃ) উপরেই ছিলনা, ওনার অনুসারী হিসেবে আমাদের উপরেও আছে। অতএব, পড়ে ইসলাম বোঝা ও পালন করার কোন বিকল্প নেই। এ কারণে ইসলামে লেখাপড়া শেখায় তাগীদ দেয়া হয়েছে। যারা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি, তাদের বিশ্বস্থ আলেমের কাছ থেকে ইসলাম শিখে আমল করতে হবে। কিন্তু একজন শিক্ষিত লোকের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, শুধু মুসলমান হয়ে কোন লাভ নেই যদি কিনা ইসলাম রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তরীকায় পালন করা না হয়। মাজহাবের অনুসারীরা একদিকে দাবী করেন যে তারা মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মত আবার অন্যদিকে অনুসরণ করেন অন্য এক ইমামকে। আশ্চর্য!

পরিশেষে এই বলে শেষ করতে হয় যে, ডঃ জাকির নায়েক হোক বা কোন ইমাম হোক, যে কোন ধর্মীয় আমল পালন করার আগে তা সঠিক কিনা তা যাচাই করার দায়িত্ব আমলকারীর।

আমাদের অবস্থা আজ এমন যে, আমরা যার যার দল ও বিভাগ নিয়ে খুশি ; ঠিক যেমনটি বলেছেন আল্লাহতালা নিম্নের আয়াতে-

> *যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। (সূরা আর-রূম - ৩০:৩২)*

কিন্তু তিনি আরও বলেছেন -

> *নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা'আয়ালার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। (সূরা আল আন-আম - ৬:১৫৯)*

ইসলামের শুরু থেকেই একটি সঙ্ঘবদ্ধ ও একতাবদ্ধ ভ্রাতিত্বমুলক উম্মাহ ছিল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নেতৃত্তে। ওনার তিরধানের পর শুরু হয় বিভিন্ন দল ও মতের উৎপত্তি। এতে উল্লাসিত হওয়ার কিছু নেই , বরং এটা আমাদের উম্মাহর জন্য অভিশাপ ও দুর্ভাগ্য।

আমাদের নানান দল ও মতের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিধর্মীরা আজ আমাদের উপর জুলুম ও নিষ্পেষণ চালাচ্ছে। অন্যদিকে , আমরা অনেকেই হয়ে যাচ্ছি পথভ্রষ্ট। আল্লাহতালা আমাদের পূর্বেই এবিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন -

> *...তারা বড় একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে।... এবং বড় একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (সূরা আল ওয়াক্বিয়া - ৫৬:১৩-১৪ এবং ৪০)*

দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম কালের মুসলিমদের মধ্য থেকে বর একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অল্পসংখ্যক প্রবেশ করবে পরবর্তী কাল সমূহ থেকে; শেষ কাল থেকে আবার বড় একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে। বোঝা যাচ্ছে, রসুলুল্লাহ (সা:) এর যুগের এবং তার পরবর্তী খুলাফা রাশেদুন এর সময়ের একদল জান্নাতে যাবে যদিও তখন মুসলিমদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। আর পরবর্তী কালের, অর্থাৎ আমাদের কালে বিশ্বব্যপী বিরাট মুসলিম জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও শুধু অল্পসংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবার শেষ যুগে যখন ইমাম মাহদী (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর সময়র অনেকে জান্নাতে যাবে। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের কাল থেকে এত বিশাল মুসলিম জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও কেন অল্পসংখ্যক লোক জান্নাত পাবে? এর মূল কারণই হচ্ছে আমাদের নতুন দল ও বিভক্তি। আমাদের যুগে খারিজী মুসলিমদের সংখ্যা অনেক বেশী। আর খারিজী হচ্ছে তারাই যারা ইসলামকে সুন্নাহ মোতাবেক পালন না করে নিজেদের মত পালন করে। দুর্ভাগ্যবশত আজ বিশ্বব্যাপী এদের সংখ্যাই অনেক বেশী। এর পরেও কি আপনারা সাবধান হবেন না?

নবীর (সাঃ) এর সময় এসব মাযহাব-তাযহাব কিছু ছিল না। ছিল শুধু ওনার সুন্নত। অতএব, সুন্নত বাদ দিয়ে কোন মাযহাব অনুসরণ করা বিদাত। ইসলামকে স্বৈরাচারী শাসক থেকে টিকিয়ে রাখার জন্য তখনকার ইমামরা ঘর বাড়ী ছেড়ে দুর দুরান্তে আস্থানা গেড়েছিল এবং লোকালয়ের মানুষজন কে ইসলাম শিখিয়েছিলেন। তাদের নিজেদের মধ্যে দূরত্ব এবং সময়ের ব্যবধান অনেক ছিল বলে তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগও ছিলোনা। যার কারণে প্রথম দিকে ডজন খানেক মাজহাবের অস্তিত্ব থাকলেও পরবর্তীকালে এই চারটি মাজহাবই টিকে যায়।

আজ আর সেই অবস্থা নেই। আজ আমাদের মাঝে কোরআন এবং হাদিসের অনুবাদ আছে, যা কিনা তিরিশ বৎসর আগেও এদেশে ছিল না। তুদুপরি আজ আমাদের মধ্যে

যোগাযোগ অনেক বেশি এবং সহজ। আজ কোন তথ্য পেতে বেশি পরিশ্রম করতে হয়না। অতএব, আজ আর আমাদের মাজহাবের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের চেষ্টা করা উচিত নবীর নিয়মে এবাদত বন্দেগি করা। এ জন্য কুরআন পড়ার সাথে সাথে পড়তে হবে নবীর (সা:) জীবনী এবং সহিহ হাদিস সমূহ। সহিহ হাদিস বলতে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা বুখারি শরিফ, মুসলিম শরিফ, মালিক মুয়াত্তা এবং সুনান আবু দাউদ কেই বোঝানো হয়। কেউ কেউ তিরমিজি শরিফকেও পঞ্চম সাড়ির হাদিস শরিফ হিসেবে গণ্য করেন। আমাদের এই লেখায় আমরা প্রথম চারটি হাদিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো। শুধু প্রয়োজন হোলেই অন্য হাদিসে যাব।

হাদিস সম্পর্কিত একটি হাদিসে আমরা দেখতে পাই -

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: লোকে বলে আবু হুরাইরা অতিরিক্ত হাদিস ব্যক্ত করেন। আসলে আল্লাহ্ জানেন আমি সত্যি বলি কিনা। তারা আরও জিজ্ঞেস করে, "বহিরাগত ও আনসারেরা কেন তার মত হাদিস বলেনা?" আসলে, আমদের বহিরাগত ভায়েরা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে বাজারে ব্যস্ত থাকত, আর আমাদের আনসার ভায়েরা ব্যস্ত থাকত তাদের সহায়সম্পত্তি নিয়ে। আমি ছিলাম একজন গরিব মানুষ যে কিনা সবসময় আল্লাহ্র নবীর (সা:) সাথে সাথে থেকে যে পেতাম তা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতাম। অতএব, আমি সবসময় সেখানে উপস্থিত থাকতাম যখন তারা (বহিরাগতরা এবং আনসারেরা) আনুপস্থিথ থাকত, এবং আমি যে মনে রাখতাম যা তারা ভুলে যেত। একদিন নবী (সা:) বললেন, "যে আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার চাঁদর সামনে বিছিয়ে রাখবে তারপর তো উঠিয়ে নিয়ে তার বুকে জড়াবে, সে কখনই আমার কোন কথা ভুলবে না।" অতএব, আমি আমার চাঁদর যা কিনা আমার একমাত্র বস্ত্র ছিল নবীর (সা:) সামনে বিছিয়ে দিতাম এবং তার কথা শেষ হলে তা উঠিয়ে নিয়ে আবার বুকে জড়াতাম । আল্লাহ্র শপথ যিনি তার নবীকে (সা:) সততের বাহক করে পাঠিয়েছেন, সেই তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তার একটি কোথাও ভুলে যাইনি। আল্লাহর শপথ, আমি নবীর (সা:) কোন কথাই বলতাম না যদি কিনা আল্লাহ্ কোরআনে এ দুটি আয়াত নাযিল না করতেন, "নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও ; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাত-কারীগণের ও। তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা*

কবুল-কারী পরম দয়ালু। " (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:১৫৯-১৬০)। (বুখারি, Book #39, Hadith #540)

নবীকে জানতে ও বুঝতে হলে আমদেরকে ওনার জীবনী পড়তে হবে ; তবেই তো আমরা ওনাকে অনুসরণ করতে পারব। কেননা, ওনাকে অনুসরণ করা মানেই আল্লাহকে কাছে পাওয়া। আল্লাহকে পাওয়া মানেই এ জীবনে জিতে যাওয়া।

বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন। অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। (সূরা আন নিসা - ৪:৬৪)

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদা-রত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন । তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষিকে আনন্দে অভিভূত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। (সূরা আল ফাতহ-৪৮:২৯)

নবীর জীবনী থেকে ইসলামের ইতিহাসও জানা যায়। আমরা জানতে পারি কিভাবে ইসলামের যাত্রা শুরু এবং কিভাবে তা ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

হাদিস পড়লে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন ইসলামী নিয়ম কানুনের কথা এবং কিভাবে সেসব নবীর (সা:) সাহাবিরা মেনে চলতেন। ইসলামের পূর্ণতা লাভ হয় দীর্ঘ ২৩ বৎসরের সংগ্রামের মাধ্যমে। এতে করে যাবতীয় খুঁটিনাটির ব্যাখ্যা রয়েছে। যার জন্য ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণ জীবন বিধান। অতঃপর, মুসলমানদের জন্য কুরআন এবং হাদিস ছাড়া আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। ইসলাম নিয়ে যে যাই লিখুক বা বলুক, সে লেখা এবং বলা হবে এই দুই (কুরআন এবং হাদিস) এর উপর নির্ভর করেই। ইসলামী আইন বা শারীয়া

ঐ দুটির উপর ভিত্তি করেই উলেমা-একরাম দ্বারা সংকলিত। ইসলামের কোন বিষয়ের ফতওয়া দেয়া কোন সাধারণ জনের কাজ নয় এবং এখানে কোন নিজস্ব মতামত দেয়ার বা নেয়ার সুযোগ নেই। ১৪০০ বৎসর ধরে অনেক বিষয়ে অনেকে অনেক কিছু লিকে গেছেন, প্রয়োজনে আমরা সেই সব গ্রন্থাবলী সরাসরি আরবী থেকেই পড়ে নেব আমাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য। আমাদের কোরআন একটি সংবিধানের মতন, এতে সব ধরনের বিষয়াদির কথা উল্লেখ আছে। বলা হয়, কোরআনকে সামনে রেখেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানটি রচনা করা হয়েছিল ; অর্থাৎ, মার্কিন সংবিধান কোরআন থেকে নেয়া! আমাদের বাংলাদেশের সংবিধান ঘেঁটে দেখলে দেখা যায় তার সাথেও কোরআনের অনেক মিল রয়েছে। অমুসলিমরা অনেকটা বাধ্য হয়েই নিজেদের মনগড়া সেকুলার সিস্টেম তৈরি করেছে কেননা তাদের ধর্ম গুলতে (হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইয়াহুদি, ইত্যাদি ধর্ম) পরিপূর্ণ কোন জীবন বিধান নেই , যা ইসলামে আছে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ মেনে চলা কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা রেখে কলেমা, নামাজ বা সালাত, রোজা বা সিয়াম, হজ্জ এবং যাকাত ঠিক থাকলে আর চিন্তার কিছু নেই।

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: এক বেদুঈন এসে নবী (সা:) কে বললেন, "আমাকে এমন আমলের কথা বলুন যা করলে আমি বেহেস্ত পাব।" তখন নবী (সা:) বললেন, "একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং ওনার সাথে কাউকে শরিক কোরোনা; নিখুঁতভাবে পাঁচ ওয়াখত নামায জামাতের সাথে আদায় কর; বাধ্যতামূলক যাকাত দান কর; এবং রমজানের পুরো মাস রোযা রাখ" । বেদুঈন বলল, "আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি এর বেশি আর কিছুই করব না" । বেদুঈনটি চলে যাবার পর নবী (সা:) বললেন, "যে বেহেস্তের একজনকে দেখতে চায় সে এই লোকটিকে দেখতে পারে" । (বুখারি, Book #23, Hadith #480)*

আল্লাহকে পেতে এর চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। অনেকে প্রশ্ন করে, তাহলে কি মদ্য পাণ, জেনা, চুরিডাকাতি ইত্যাদি করেও উক্ত পাঁচটি স্তম্ভ ঠিক রাখলে হবে? তাদের কাছে আমার পাল্টা প্রশ্ন, ওসব কি ইসলামে জায়েজ? যদিও ওসব করলে ইসলাম থেকে একজন মুসলমান খারিজ হবে না, কিন্তু ওসব কর্মকাণ্ডের জন্য পরকালে শাস্তি পেতে হবে। বাস্তবিকে, যদি কেউ আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে কোন শিরক না করে নিখুঁতভাবে এবাদত করে, যাকাত দেয়, রোজা রাখে, সেই লোক কি কোন অন্যায় করতে পারে? কারণ প্রতিটি এবাদতেই রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিকার এবং নিরাপত্তা।

হাদিস শাস্ত্র খুঁজলে আমরা দেখব যে প্রতিটি এবাদতের জন্য পুণ্য ও পরিত্রাণ আছে; যেমন ধরুন, এবাদতের নিয়তে আমরা যখন অজু করি, প্রতিটি পানির ফোঁটার সাথে সাথে আমাদের গুনাহ মাফ হয়ে যায়; নামায আমাদের অন্যায় থেকে দূরে রাখে; রোজা আমাদের কাম-রিপুকে দমন করতে শেখায়; ইত্যাদি। একজন মুসলমানের জীবনটাই এবাদতে পূর্ণ। ওঠা, বসা, চাল, চলন, কথা বার্তায় এমনকি চিন্তাভাবনাতেও আল্লাহতালা আমাদের আখেরাতের হিসাবের খাতায় সওয়াব লিখে দেন। এমন আয়োজন আর কোন ধর্মতে নেই। তদ্রূপ, আমরা আরও একটি হাদিসে দেখতে পাই যে এ কয়টি মূল বিষয় ঘিরেই মূলত ইসলাম -

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: একদিন নবী (সা:) কিছু লোকজনের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন তখন জিবরীল ফেরেশতা মানুষ বেশে আসেন এবং জিজ্ঞেস করলেন,"ধর্মবিশ্বাস কি?" আল্লাহর নবী (সা:) জবাব দিলেন,'ধর্মবিশ্বাস হোল আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া, তাঁর নবীদের, এবং পুনরুত্থানে। "এরপর তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন,"ইসলাম কি? "আল্লাহর নবী (সা:) উত্তরে বললেন,"আল্লাহ স্বতন্ত্রেবং আল্লাহ্ ছাড়া এর কাউকে উপাসনা না করা, নিখুঁতভাবে নামাজ পড়া, বাধ্যতামূলক দান-খায়রাত (জাকাত) করা এবং রমজান মাসে রোজা রাখা। "এরপর তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন,"ইহসান (পরিপূর্ণতা) কি? "আল্লাহর নবীর (সা:) উত্তর,"আল্লাহ্কে এমনভাবে উপাসনা করা যেন আমরা তাকে দেখতে পারছি, এবং যদি সেরূপ নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা সম্ভব না নয় তাহলে বিবেচনা করা যেন তিনি আপনাকে দেখছেন। এর পরে তিনি আরোও জিজ্ঞেস করলেন,"শেষ ঘণ্টা (কেয়ামত) কবে প্রতিষ্ঠিত হবে? আল্লাহর নবীর (সা:) উত্তর,"জবাব দানকারীর চেয়ে প্রশ্নকারীই এ বিষয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন। তবে আমি এর ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত সম্পর্কে আপনাকে অবগত করতে পারি: ১) যখন একজন দাসী তার মনিবের জন্ম দেবে; ২) যখন একপাল কালো মেষ (বা উট) পালকেরা দম্ভ শুরু করবে এবং উচ্চ ভবন নির্মাণে অন্যান্যদের সাথে প্রতিযোগীটা করবে। আর এ বিষয়টি হচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের একটি যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। নবী (সা:) তারপর আবৃত্তি করলেন: "নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামী-কল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (৩১:৩৪)। ঐ ব্যক্তি (জিবরীল) উঠে চলে যান এবং নবী (সা:) তাকে ডেকে আনার জন্য সাহাবীদের পাঠালেন, কিন্তু তারা তাকে*

দেখতে পেলেন না। তারপর নবী (সা:) বলেন, "তিনি ছিলেন জিবরীল (আ-সঃ) যিনি মানুষকেতাদের ধর্ম শেখাতে এসেছিলেন." আবু 'আবদুল্লাহ বললেন: তিনি (নবী) উল্লেখিত সব বিষয় বিশ্বাস অংশ হিসাবে যে বিবেচিত করেন। (বুখারি, Book #2, Hadith #47)

আমদের ঘর বাড়ি ছেড়ে সন্যাষ্সীবা সূফী হওয়ার দরকার নেই। মুলত সন্ন্যাস ও সূফীবাদ শীয়াদের থেকে আগত। আমাদের নবী (সা:) তা করেননি এবং করতে বলেননি। তবলীগী ভায়েরা কি কারণে যে ঘর সংসার ছেড়ে চিল্লায় যান সেটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখা দরকার। কই, নবীজির সাহাবিরা তো তা কখনও করেননি! বরং তারা তাদের ঘর সংসার সব ঠিক রেখেই ইসলাম প্রচার করতেন। এ নিয়ে কোন সংশয় নেই যে, আজকের বিশ্ব ইজতেমা একটি নতুন প্রচলন যা নবীর (সাঃ) যুগে ছিলোনা। যদিও ইসলামী আলোচনা সভা বা মাহফিল করাতে কোন বাধা নেই, কিন্তু প্রতি বছর আনুষ্ঠানিকতার সাথে ইজতেমা করা একটি নতুন বিষয় ; অতএব, এটি একটি বিদাত। ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীদের ধারনা যে, আখেরি মোনাজাতে শরিক হতে পারলেই সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, সারা বৎসর নামায রোজা না করলেও বা বছরজুড়ে খারাব কাজ করলেও। এটি অবশ্যই একটি ভ্রান্ত ধারনা যার কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুধু তবলীগী জামাতের দায়িত্ব নয়, বরং প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব , এবং এবাদতের একটি অংশ -

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বলেছেন, "মানুষের কাছে আমার শিক্ষা প্রচার কর যদিও কিনা সেটা একটি বাক্য হয়, এবং সবাইকে বনি ইসরাইলের গল্প শোনাও যা তোমাদের শেখান হয়েছে, কেননা এতে দশের কিছু নেই। যে ইচ্ছাকৃত আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলে, দোজখের আগুনে তার যায়গা হবে।" (বুখারি, Book #56, Hadith #667)

কোরআনেও আমরা আয়াত পাই যেখানে আল্লাহ্‌র পথে আসার দাওয়াত দেয়ার কথা বলা হয়েছে, শুধু নিজেদের মধ্যেই নয় দুনিয়ার সবাইকে -

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। (সূরা নাহল - ১৬:১২৫)

এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে। আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তা' আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। (সূরা আয-যারিয়াত - ৫১:৫৫-৫৮)

মূলতই তাই, আল্লাহতালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন ওনার এবাদত করার জন্য, যেন আমরা নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে ওনার এবাদত করতে পারি; সে জন্য তিনি অন্য সব কিছুই আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

এবং আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনা-বলী রয়েছে। (সূরা আল জাসিয়া - ৪৫:১৩)

ইসলামী রাষ্ট্রেয়াক্সবকাঠামোর দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় যে সেটা এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে এবাদতের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে দুনিয়ার দায়িত্ব কমিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমরা সেই ইসলামী রাষ্ট্রর নিয়ম কানুন সব বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি সেকুলার ক্যাপিটালিস্ট বা পুঁজিবাদী সিস্টেম অনুসরণ করে তাতে নিমজ্জিত রয়েছি। যে কারণে আমরা এবাদতের চেয়ে দুনিয়া নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকি।

এই উপমহাদেশে বিশ্ব ইস্তেমা যেমন একটি বিদাত যা আর কোন মুসলিম দেশে হয়না; তেমনি, মিলাদ, ওরশ, চেহলাম এবং চল্লিশাও বিদআত। নবী (সা:) যুগে এসবের প্রচলন ছিলনা এবং এসবের অনুকূলে কোন দলিলও পাওয়া যায়না। আর যে সব দলিল হিসেবে পেশ করা হয়, তার বেশিরভাগই জাল। এগুলো সব আমদের নিজেদের মনগড়া ভিত্তিহীন অনুষ্ঠান এবং প্রথা মাত্র। এ সম্পর্কে শয়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম "তাবলীগ জামাত ও দেবনদীগণ" বইয়ের ১৭ থেকে ১৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন -

"... ছলাত ও সালাম নাযিল হোক নবী করিম (সা:) এর উপর, যিনি আমাদেরকে আল্লাহু সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অটল ও অবিচল থাকার সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশিকা হিসাবে কুরআন ও সুন্নাহ দান করে গেছেন । এদুটির মাধ্যমে একটি জাহিলি সমাজকে শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজে পরিণত করেছিলেন । মুসলিম জাতি যখনই এদুটিকে পরিত্যাগ করবে তখনই তাদের ভেতর জাহিলিয়াত ফিরে আসবে। ...

মুহাম্মদ (সা:) এর অধিকাংশ প্রেমিক ও অনুসারী (৭৩ দলের মধ্যে ৭২ দলই) পথভ্রষ্ট, জাহান্নামের অধিবাসী। এদের সকলের আসল অপরাধ হোল কুরআন ও সুন্নাহ' র ভ্রান্ত অর্থ ও ব্যাখ্যা করা। এবং কুরআন সুন্নাহ বহির্ভূত অনেক বিষয়কে দীনের অন্তর্ভুক্ত করা; ... আমাদের বাংলাদেশ-ভারত বর্ষের মুসলিম সম্প্রদায় যে সব বাতিলের সয়লাবে নিমজ্জিত তাহলো সূফীবাদ , মাজহাবই গোঁড়ামি, বিধর্মীদের প্রবর্তিত দলমত; যেমন কাদিয়ানী, বাহাই, ইত্যাদি। এসব বাতিল ৭২তি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহান্নামী দলের সেতুবন্ধন। ... আমাদের দেশে তথাকথিত তাবলীগ জামাত দেওবন্দি ধারায় প্রবাহিত একটি দাওয়াতি দল। তাদের দাওয়াতের অবলম্বন হোল ফাযাইল। ইসলামের যে সব বিষয় ফজিলত দ্বারা বুঝানো সম্ভব , সে সব বিষয়ে সহিহ, জইফ, জাল-বানোয়াট হাদিসের অবতারণা করে। ফাযাইল দিয়ে দলের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশে সিলেবাস প্রণয়ন করেছে যার নাম "তাবলীগী নিসাব" , বা "ফাযাইলে আমল" । ... অনেক ইসলামী পণ্ডিত মনে করেন, ইসলাম ধর্ম সঠিক ও পুরনাঙ্গ ভাবে না জানার ও না মানার কারণে আল্লাহ্র গজব হিসেবেই বিশ্ব ইজতেমা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ..."

এর সত্যতা আমরা দেখতে পাই নিম্নল্লেখিত হাদিস সমূহে,

নবী (সা:) বলেছেন, "দুই কিতাবের অনুসারীরা বাহাত্তুরতি (৭২) অংশে বিভক্ত হয়েছে। এই উম্মাহ বিভক্ত হবে তেহাত্তর (৭৩) অংশে, যার সবগুলই যাবে দোজখের আগুনে শুধু একটি ছাড়া, সেটি হোল আমার জামাত। আমার উম্মাহর কিছু অংশ খেয়াল খুশি মত পরিচালিত হবে , একজন জলাতঙ্ক রুগীর মত, কোন রগ ও হাড়ের জড় এই স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পাবে না ।" (আবু দাউদ ২/৫০৩ এবং Book #40, Hadith #4579)

অতএব আমাদের সাবধান হওয়া উচিত আমরা যেন আমাদের নবী (সা:) এর জামাত থেকে বিচ্যুত হয়ে না যাই। আরও একটি হাদিসে আমরা দেখতে পাই,

হুদাইফা বিন আল-ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত: সবাই আল্লাহর নবীর (সা:) কাছে শুধু ভাল বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করতো , কিন্তু আমি ওনাকে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার জন্য । অতএব আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ও আল্লাহর নবী! আমরা অজ্ঞতা এবং খারাপ পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছিলাম, তারপর আল্লাহ্ আমাদের ভালর দিকে (অর্থাৎ ইসলামে) নিয়ে এলেন; এই ভালর

পর কি আবার খারাপ কিছু হবে ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, "সেই খারাপের পর কি আবার ভাল কিছু হবে ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তা হবে দোষ বা কলঙ্ক যুক্ত (অর্থাৎ খাটি নয়)।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি ধরনের কলঙ্ক?" তিনি উত্তরে বললেন, "পরবর্তীকালে কিছু লোক আসবে যারা আমার ঐতিহ্য বর্জন করে ভিন্নমতে লোকদের পরিচালনা করবে। তোমরা তাদের কিছু মেনে নেবে এবং কিছু বাদ দেবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সেই ভালোর পরে কি আবার খারাপ কিছু হবে?" তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, কিছু লোক দোজখের দরজায় দাড়িয়ে লোকদের ডাকবে, যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তাদের ঐ সব লোক দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করবে।" আমি বললাম, "ও আল্লাহর নবী! আপনি কি আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দেবেন ?" তিনি বললেন, "তারা আমাদেরই মধ্যেকার লোক এবং তারা আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে।" আমি বললাম, "আপনি আমাকে কি আদেশ করবেন যদি সে অবস্থা আমার জিবদ্দশায় হয়?" তিনি বললেন, "মুসলিম এবং তাদের ইমামের (শাসক) সাথে যুক্ত থাকো।" আমি বললাম, "যদি কোন মুসলিম দল বা ইমাম (শাসক) না থাকে?" তিনি বললেন, "তাহলে সেইসব দল বা অংশগুলো থেকে দূরে থাকো যদিও তোমাকে গাছের মূল ভক্ষণ করে বাঁচতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে মৃত্যু সে অবস্থায় তোমার জীবনের অবসান ঘটায়।" (বুখারি, Book #88, Hadith #206)

কোরআনেও আল্লাহতালা আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন,

নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা'আয়ালার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। (সূরা আল আন-আম - ৬:১৫৯)

এত পরিষ্কার নির্দেশ এবং সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও শীয়ারা সুন্নাহ থেকে বেরিয়ে আলাদা দলের সৃষ্টি করে আল্লাহ র সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছে। অন্যদিকে, আমরা টাকা-পয়সার বিনিময়ে দোয়া-দরুদ কেনা-বেচা করছি যা আল্লাহতালা অপছন্দ করেন -

অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে।

অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। (সূরা আল বাক্বারাহ – ২:৭৯)

আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখা-শোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় কোরো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ কোরো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা আল মায়েদাহ – ৫:৪৪)

তারা আল্লাহর আয়াত সমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট। (সূরা আত তাওবাহ – ৯:৯)

আমরা দীনি শিক্ষা নেব জীবনে উৎকর্ষতা আনার জন্য আর আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য নয়। জীবিকার জন্য অন্য অনেক কিছুই করার আছে। আমাদের মাদ্রাসা পরিচালকদের এবং পৃষ্ঠপোষকদের এ নিয়ে ভাবা দরকার। শুধু ইসলাম শিক্ষা মুখস্থ করে কোন লাভ নেই, ইসলাম বুঝে শিখতে হবে; এবং তার জন্য দরকার আরবী ভাষায় দক্ষতা। সাথে সাথে দরকার দুনিয়াবি বা সেকুলার শিক্ষা, ইসলাম নির্ভর হালাল জীবিকার রাস্তা খোঁজার জন্য। এ ক্ষেত্রে পিস টিভির ডঃ যাকির নায়েক সফলভাবে "ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কুল (আই, আই, এস)" নামক একটি স্কুল পরিচালনা করে আসছেন ভারতের মুম্বাই শহরে; আমরা উক্ত স্কুলের মডেল অনুসরণ করে আমাদের বিদ্যমান স্কুল গুলকে পরিবর্তন করতে পারি যেখানে আমাদের বাচ্চারা পড়ালেখা শিখে তুখড় মুসলিম নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে এবং বিশ্ব নেতায় পরিণত হবে। ইতিমধ্যেই ঢাকার উত্তরা এবং লালমাটিয়ায় পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নামে একটি স্কুল চালু হয়েছে আই আই এস' এর অনুকরণে; দেখা যাক শেষপর্যন্ত তারা কেমন করে।

আমাদের দেশে কিছু ইসলামী স্কুল আছে কিন্তু তাদের সিলেবাস ঠিক নেই। আমাদের চেষ্টা থাকতে হবে আমাদের বাচ্চাদের কোরআনে হাফেয করা। তাই ছোট ছোট সূরাগুলো আগে মুখস্থ করাতে পারলে পরে বড়গুলো মুখুস্তর চেষ্টা করতে পারবে। মোট ১১৪ টি সূরার মধ্যে ছোট সূরাগুলো নীচের টেবিল এর মুখস্থর ধারা কলামে ক্রমান্বয়ে নম্বর দিয়ে দেয়া হোলঃ

সূরা নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	মুখস্থ ধারা
১	সূরা আল ফাতিহা	৭	১
২	সূরা আল বাক্বারাহ	২৮৬	
৩	সূরা আল ইমরান	২০০	
৪	সূরা আন নিসা	১৭৬	
৫	সূরা আল মায়েদাহ	১২০	
৬	সূরা আল আন-আম	১৬৫	
৭	সূরা আল আ'রাফ	২০৬	
৮	সূরা আল-আনফাল	৭৫	
৯	সূরা আত তাওবাহ	১২৯	
১০	সূরা ইউনুস	১০৯	
১১	সূরা হুদ	১২৩	
১২	সূরা ইউসুফ	১১১	
১৩	সূরা রা'দ	৪৩	
১৪	সূরা ইব্রাহীম	৫২	
১৫	সূরা হিজর	৯৯	
১৬	সূরা নাহল	১২৮	
১৭	সূরা বনী ইসরাঈল	১১১	
১৮	সূরা কাহফ	১১০	
১৯	সূরা মারইয়াম	৯৮	
২০	সূরা ত্বোয়া-হা	১৩৫	
২১	সূরা আম্বিয়া	১১২	
২২	সূরা হাজ্জ	৭৮	
২৩	সূরা আল মু'মিনুন	১১৮	
২৪	সূরা আন-নূর	৬৪	
২৫	সূরা আল-ফুরকান	৭৭	
২৬	সূরা আশ-শো 'আরা	২২৭	
২৭	সূরা নমল	৯৩	
২৮	সূরা আল কাসাস	৮৮	
২৯	সূরা আল আনকাবুত	৬৯	
৩০	সূরা আর-রূম	৬০	

৩১	সূরা লোকমান	৩৪	
৩২	সূরা সেজদাহ	৩০	
৩৩	সূরা আল আহযাব	৭৩	
৩৪	সূরা সাবা	৫৪	
৩৫	সূরা ফাতির	৪৫	
৩৬	সূরা ইয়াসীন	৮৩	
৩৭	সূরা আস-সাফফাত	১৮২	
৩৮	সূরা ছোয়াদ	৮৮	
৩৯	সূরা আল-যুমার	৭৫	
৪০	সূরা আল-মু ’মিন	৮৫	
৪১	সূরা হা-মীম সেজদাহ	৫৪	
৪২	সূরা আশ-শুরা	৫৩	
৪৩	সূরা যুখরুফ	৮৯	
৪৪	সূরা আদ দোখান	৫৯	
৪৫	সূরা আল জাসিয়া	৩৭	
৪৬	সূরা আল আহক্বাফ	৩৫	
৪৭	সূরা মুহাম্মদ	৩৮	
৪৮	সূরা আল ফাতহ	২৯	
৪৯	সূরা আল হুজরাত	১৮	
৫০	সূরা ক্বাফ	৪৫	
৫১	সূরা আয-যারিয়াত	৬০	
৫২	সূরা আত্ব তূর	৪৯	
৫৩	সূরা আন-নাজম	৬২	
৫৪	সূরা আল ক্বামার	৫৫	
৫৫	সূরা আর রহমান	৭৮	
৫৬	সূরা আল ওয়াক্বিয়া	৯৬	
৫৭	সূরা আল হাদীদ	২৯	
৫৮	সূরা আল মুজাদালাহ	২২	
৫৯	সূরা আল হাশর	২৪	
৬০	সূরা আল মুমতাহিনা	১৩	
৬১	সূরা আছ-ছফ	১৪	

৬২	সূরা আল জুমুআহ	১১	২৪
৬৩	সূরা মুনাফিকুন	১১	২৩
৬৪	সূরা আত-তাগাবুন	১৮	
৬৫	সূরা আত্ব-ত্বালাক্ব	১২	২৬
৬৬	সূরা আত-তাহরীম	১২	২৫
৬৭	সূরা আল মুলক	৩০	
৬৮	সূরা আল কলম	৫২	
৬৯	সূরা আল হাক্কাহ	৫২	
৭০	সূরা আল মা'আরিজ	৪৪	
৭১	সূরা নূহ	২৮	
৭২	সূরা আল জিন	২৮	
৭৩	সূরা মুযযামমিল	২০	
৭৪	সূরা আল মুদ্দাসসির	৫৬	
৭৫	সূরা আল ক্বেয়ামাহ	৪০	
৭৬	সূরা আদ-দাহর	৩১	
৭৭	সূরা আল মুরসালাত	৫০	
৭৮	সূরা আন-নাবা	৪০	
৭৯	সূরা আন-নযিআ 'ত	৪৬	
৮০	সূরা আবাসা	৪২	
৮১	সূরা আত-তাকভীর	২৯	
৮২	সূরা আল ইনফিতার	১৯	
৮৩	সূরা আত-তাতফীফ	৩৬	
৮৪	সূরা আল ইনশিক্বাক্ব	২৫	
৮৫	সূরা আল বুরূজ	২২	
৮৬	সূরা আত্ব-তারিক্ব	১৭	
৮৭	সূরা আল আ'লা	১৯	
৮৮	সূরা আল গাশিয়াহ	২৬	
৮৯	সূরা আল ফজর	৩০	
৯০	সূরা আল বালাদ	২০	
৯১	সূরা আশ-শামস	১৫	
৯২	সূরা আল লায়ল	২১	

৯৩	সূরা আদ্ব-দ্বোহা	১১	২২
৯৪	সূরা আল ইনশিরাহ	৮	১৮
৯৫	সূরা ত্বীন	৮	১৭
৯৬	সূরা আলাক	১৯	
৯৭	সূরা কদর	৫	১০
৯৮	সূরা বাইয়্যিনাহ	৮	১৬
৯৯	সূরা যিলযাল	৮	১৫
১০০	সূরা আদিয়াত	১১	২১
১০১	সূরা কারেয়া	১১	২০
১০২	সূরা তাকাসুর	৮	১৪
১০৩	সূরা আছর	৩	৫
১০৪	সূরা হুমাযাহ	৯	১৯
১০৫	সূরা ফীল	৫	৯
১০৬	সূরা কোরাইশ	৪	৬
১০৭	সূরা মাউন	৭	১৩
১০৮	সূরা কাওসার	৩	৪
১০৯	সূরা কাফিরুন	৬	১২
১১০	সূরা নছর	৩	৩
১১১	সূরা লাহাব	৫	৮
১১২	সূরা এখলাছ	৪	২
১১৩	সূরা ফালাক্ব	৫	৭
১১৪	সূরা নাস	৬	১১

গুরুত্তের কথা বিবেচনা করে সবচেয়ে প্রথমে থাকলো সূরা ফাতেহা , কেননা -

> *আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি। (সূরা হিজর - ১৫:৮৭)*

কোরানের এই আয়াতটি প্রথমে পড়ে আমি কোন কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পড়ে হাদিস খুঁজে এর রহস্য উতঘাতন করি -

আবু সাইদ বিন আল-মুয়াল্লা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি যখন মসজিদে নামাজ পড়ছিলাম, আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আমাকে ডাকলেন কিন্তু আমি কোন সাড়া দিলাম না। পরে আমি তাকে বললাম, "ও আল্লাহ্‌র রাসুল! আমি প্রার্থনায় ছিলাম।" তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌ কি বলেন নি- "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে। (৮:২৪)"।" তারপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমি মসজিদ ছেড়ে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে কোরানের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরাটি শেখাব।" অতপরঃ তিনি আমার হাতটি ধরে যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তাকে বললাম, "আপনি কি আমাকে বলেন নি যে, "আমি তোমাকে কোরানের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরাটি শেখাব ?" তিনি বললেন, "আল-হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন যা কিনা আল-সাবা আল-মাথানি (অর্থাৎ, সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত) এবং অভিজাত কোরআন যা কিনা আমাকে দেয়া হয়েছে।" (বুখারি, Book #60, Hadith #1); (Book #60, Hadith #226)

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ'র নবী (সাঃ) বলেন, "কোরানের মুল বিষয়টি হচ্ছে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত (আল-মাথাইনি) যে কিনা কোরানের মহত্ব (অর্থাৎ, সূরা আল-ফাতিহা)।" (বুখারি, Book #60, Hadith #227)

তাছাড়া, এই সূরাটি সালাতের প্রত্যেক রাকাতেই লাগে। সূরা আল -ফাতিহা ছাড়া সালাতই হয়না। প্রত্যেক রাকাতেই সূরা ফাতেহা পড়তে হয় , এমনকি জামাতেও একাকী ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে। অনেকের ধারণা, ইমামের পেছনে জামাতে নামাজ পড়লে কোন কিছুই নিজেকে পড়তে হয়না; ইমামের ঘারে সব দায়িত্ব চলে যায়; এটা ভুল ধারণা।

উবাদা বিন আস-সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "যে তার সালাতে সুরা-ফাতেহা পড়েনা, তার সালাতই অকার্যকর।" (বুখারি, Book #12, Hadith #723)

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ সব সালাতেই কোরআন তেলাঅয়াত করা হয় যেমনটি আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) শুনিয়ে পড়তেন, আমরাও সে সব সালাতে উচ্চস্বরে পড়ে থাকি; আর যে সব সালাতে উনি আসতে পড়েছেন, আমরাও আসতে পড়ি। শুধু সুরা-ফাতেহা পড়লেই যথেষ্ট, তবে সাথে অন্য কোন সূরা পড়লে ভাল।" (বুখারি, Book #12, Hadith #739)

সুরা ফাতেহার মর্তবা এত বেশি যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের উচিত রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার সোনার বাংলা" গানটি বাদ দিয়ে সে যায়গায় এই সূরাটি পাঠ করা অর্থ বুঝে; যাতে করে, আমাদের ইমান ঠিক থাকে এবং আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত পুরো জাতির উপর।

কোরানের সবচেয়ে বড় সূরাটি হচ্ছে সূরা বাক্বারাহ , যাতে ২৮৬ টি আয়াত আছে। এই বড় সূরাটিটেই রয়েছে কোরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ২৫৫ নং আয়াতটি যা কিনা "আয়াতুল কুরসি" নামে পরিচিত। যদিও এটি একটি লম্বা আয়াত, তথাপিও এই আয়াতটি আমাদের বাচ্চাদের শেখানো দরকার এটার গুরুত্তের কথা বিবেচনা করে। এবার আসুন আমরা দেখি এই আয়াতটির অর্থ কি এবং কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ -

> *আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:২৫৫)*

এবার দেখি হাদিসে এই আয়াতটি সম্পর্কে কি বলা আছে -

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আমাকে আদেশ করলেন রমযান মাসের যাকাত রাজস্ব পাহারা দিতে। এক রাতে একজন এসে খাদ্য সামগ্রী চুরি করতে লাগলো। আমি তাকে ধরে বললাম, "আমি তোমাকে নবীর কাছে নিয়ে যাবো!" অতপরঃ সেই লোকটি আমাকে বলল, "আমি খুব গরিব আমার আর কোন উপায় ছিলোনা। আমাকে এবার মাফ করে ছেড়ে দাও, আমি আর আসব না।" অতএব, আমার দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দেই। পরদিন সে আবার চুরি করতে আসলে আমি তাকে ধরে নবীর কাছে আনতে চাইলে সে আবার একই কথা বলল এবং আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সে যখন আবার পরের দিন একই কাজ করতে এসে আমার কাছে ধরা খায়, সে তখন বলল, "দয়া করে আমাকে আল্লাহ্‌র*

নবীর কাছে নেবে না, আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি যা থেকে আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবে। তুমি যখন ঘুমাতে যাবে , আয়াতুল কুরসি (২:২৫৫) পড়বে, যার বদৌলতে আল্লাহ্‌ তোমার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করবেন যে কিনা তোমাকে সারা রাত পাহারা দেবে; ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।" গল্পটি শোনার পর নবী (সাঃ) বললেন, "যে লোকটি রাতে তোমার কাছে এসেছিল তোমাকে সত্যি কথাই বলেছে যদিও সে কিনা একজন মিথ্যাবাদী; সে ছিল শয়তান।" (বুখারি, Book #61, Hadith #530 ; Book #38, Hadith #505t *এবং* Book #54, Hadith #495)

অতএব দেখা যাচ্ছে, শয়তান তাড়াতে এবং বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে আয়াতুল কুরসি একটি উত্তম দোয়া।

বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে সূরা গুলো মখস্থ করাতে একজন ভাল ক্বারি রেখে পড়ালে অথবা কোন শুক্রবারের ইসলামী স্কুলে (Friday Islamic School) বাচ্চাদের আরবী পড়ালে ভাল হয়। সাত থেকে আট বছর পর্যন্ত আরবী পড়া আর সূরা মুখস্ত করায় বাচ্চারা ব্যস্ত থাকলে, নয় বছর বয়স থেকে ওদের সালাত পড়া শেখালে ওদের জন্য সহজ হবে সাথে সাথে ওদের সিয়াম পালনেও উৎসাহিত করতে হবে; কেননা, দশ বছর থেকে ওদের উপর সালাত ও সিয়াম ফরজ হয়ে যাবে। অতএব, ওদের অবশ্যই দশ বছরের মধ্যে নামাজ রোযার জন্য তৈরি হয়ে যেতে হবে। আমার জানামতে টাইম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল যাকিনা ডঃ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ এবং ডঃ মঞ্জুরে এলাহি প্রমুখ দ্বারা পরিচালিত , তাদের তিনটি ক্যাম্পাসে - উত্তরা, গুলশান ও মিরপুর এ শুক্রবারের ইসলামী স্কুল চালু রেখেছেন। আপনারা চাইলে ঐ স্কুলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন; ঠিকানা -

টাইম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উত্তরা ক্যাম্পাস, বাড়ী নং ৮০, সড়ক নং ১৫, সেক্টর ১১, উত্তরা, ঢাকা। ফোনঃ ৮৯৯১১৫৬-৭; ০১৯৩০৮০০২৯৬-৭ ।

শুধু কোরআন খতম করে আরবী শেখা শেষ করলে চলবে না। ওদের আরবী ভাষা শেখার নিয়তে (যাতে ওরা কোরআন পড়ে বুঝতে পারে এবং আরবী ভাষায় কথোপকথন করতে পারে) আরবী চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। এই পর্যায়ে একজন আরবী ভাষায় পড়ালেখা করা ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে রাখলে ভাল হয় যে কিনা আরবী ব্যাকরণ শেখাতে পারবে। সাধারণত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র/ছাত্রী এমন একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা হতে পারবেন। অথবা, আরবী ভাষা শেখায় এমন কোন স্কুলে ওদের পাঠালে হয় সপ্তাহে দু-একদিন। ওরা সেকুলার স্কুলে বাংলা এবং ইংরেজি শিখবে আর

আরবী শিখবে তৃতীয় ভাষা হিসেবে। বাচ্চারা একসাথে কয়েকটি ভাষা একসাথে শিখতে পারে অনায়েশে। আমাদের একটি অদ্ভুত ব্যাপার হোল, আমরা বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা বুঝে শিখি আর আরবী শিখি না বুঝে শুধু পড়া ! লিখতেও শিখি না! শুধু সওয়াব কামনই উদ্দেশ্য, শুধু পড়লেই কি চলবে? বুঝে আমল করার কোন দরকার নেই? অথচ, বুঝে আমল করাই প্রধান শর্ত! অবস্থা এমন যে, আমরা যদি ইংরেজি শুধু পড়তে শিখি কিছু না বুঝে, তাহলে ব্যাপারটি কেমন হবে? এমনই একটি ব্যবস্থা করে রেখেছি আমরা আমাদের মাদ্রাসাগুলতে আরবী ভাষার ক্ষেত্রে।

নিয়মিত থাকলে, আমরা আশা করতে পারি যে আমাদের বাচ্চারা তিন থেকে চার বছরে আরবী ভাষায় লিখতে, পড়তে এবং কথা বলতে পারবে। এই ভাষায় পারদর্শিতা এসে গেলে ওরা নিজেরাই বিভিন্ন ইসলামী বই পত্র সরাসরি আরবী ভাষায় পড়ে শুদ্ধ ইসলাম শিখতে পারবে। কোন অনুবাদের প্রয়োজন হবে না , ইনশাল্লাহ। মুহাম্মাদপুরের আল - আমিন মসজিদ দ্বারা পরিচালিত মুহাম্মদি মডেল মাদ্রাসাতে ছয় মাস থেকে এক বৎসরের মধ্যে বাচ্চাদের আরবী ভাষা শেখানোর একটি প্রোগ্রাম চালু আছে। আমাদের উচিত ঐ মডেল সব মাদ্রাসাতে চালু করা।

বুকের মধ্যে কোরানের আলো নিয়ে একজন আলেম হয়ে আমাদের বাচ্চারা যখন পৃথিবীর দুর দুরান্তে যাবে তারা তখন ভাল মন্দ বিচারের জ্ঞান রাখবে এবং নিজেদের হারাম, বিদআত ও শিরক থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পাবে। সাথে সাথে তারা ইসলাম প্রচারও করতে পারবে। শেখ ইমরান নযর হোসেন প্রায়ই তার বিভিন্ন লেকচার গুলতে এ বিষয়টি উল্লেখ করে থাকেন। তিনি সেকুলার লেখাপড়া করার আগে ইসলামী শিক্ষা গ্রহন করেন এবং এতে করে তার সেকুলার শিক্ষার ফাঁক গুলো ধরতে সহজ হয়েছে। আমি নিজেও ঐ সুবিধা অনুভব করেছি যখন আমি আমার প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাই। ওখানকার সমাজ ও আচরণ আমাকে নষ্ট করতে পারেনি এবং আমি ইসলাম প্রচারে সচেষ্ট ছিলাম।

মশাররফ হোসেন খান এর “সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর ” বইটি পড়ে জানতে পারলাম যে তিতুমীর বাংলা, উর্দু, ফার্সি এবং আরবী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সে সময় শিক্ষিত মুসলিম পরিবারগুলতে সাধারণত সবাই ঐ চারটি ভাষা জানতেন। যার কারনে তারা অনায়েশে বিভিন্ন দেশের লোকজনদের সাথে মেলা মেশাও করতে পারতেন। মূলত ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তখনকার মুসলমানরা ইংরেজী শিখত না। এবং আমার মতে ওটাই ছিল সে সময়কার মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ভুল। কেননা , ইংরেজী না জানার কারণে এক বদ হিন্দু দোভাষীর (রামচন্দ্র) পাল্লায় পরেই তিতুমীরের সাথে

ব্রিটিশদের শেষ যুদ্ধটি ঘটেছিল , যা কিনা হয়তবা এড়ানো যেত। আমার জানা ছিলোনা যে "তিতুমীর" ওনার আসল নাম নয় বরং তার দাদির দেয়া নাম (ওনার আসল পুরো নাম ছিল - সাইয়েদ মীর নিসার আলী)। ছোটকালে প্রায় অসুস্থ থাকতেন বলে ওনার দাদী অনাকে তেঁতো বনউশুধি খাওয়াতেন এবং তিনিও আগ্রহের সাথে সেই ঔষধ সেবন করতেন বলে তার দাদী অনাকে আদর করে "তিতা মীর" বলে ডাকতেন। পরবর্তীতে যে নামটা লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে "তিতুমীর" হয়ে যায়।

২৬শে জুলাই ২০১১ তারিখের প্রথম আলো পত্রিকায় "সারা দেশে একই পদ্ধতিতে খতম তারাবিহ্ পড়ার আহ্বান" শিরোনামে একটি খবর বেরিয়েছে যাতে দেশব্যাপী একই পদ্ধতিতে খতম তারাবী নামায পড়ার পরামর্শ দিয়েছে আমাদের ইসলামী ফাউন্ডেশন। নবীর (সা:) যুগে খতম তারাবী বলে কোন কিছু ছিলনা। তাহাজ্জুদ নামাজই পরবর্তীতে রমজান মাসে তারাবীহ নামায বলে গণ্য হয়। তারাবীহ শব্দের অর্থ হল "আরাম" , এ নামাযটি খুলাফায়ে রাশেদুনের সময় যখন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) খলিফা ছিলেন তখন থেকে প্রচলিত, এর আগে এ নামাযটি জামাতে পড়া হতোনা -

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (সা:) বলেছেন, "যে কিনা আল্লাহর রহমতের আশায় আনুগত্যের সাথে রমযান মাসের প্রতি রাতে এবাদত করল, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। " ইবনে শিহাব (সহ বর্ণনাকারী) বলেছেন, "আল্লাহর নবীর মৃত্যুর পরও এর প্রচলন ছিল (অর্থাৎ রমযান মাসে একক ভাবে নফল নামায পড়া, জামাতে নয়), যা আবু বকরের খিলাফতের পরও ওমরের খিলাফতের প্রথমাংশ পর্যন্ত চর্চা হত। "আব্দুর রাহমান বিন আব্দুল কারি বলেছেন, "আমি এক রমজান রাতে খলিফা ওমর বিন আল-খাত্তাবের সাথে এক মসজিদ পরিদর্শনে গিয়ে দেখি সেখানে লোকজন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নামায পড়ছে। কেও একা, কেও ছোট জামাতে ইমামের পেছনে; অতএব, ওমর বললেন, "আমার মতে এভাবে নামায পড়ার চেয়ে সবাই মিলে এক ইমামের পেছনে জামাতে পড়া ভাল। " অতঃপর তিনি উবাই বিন কাবকে ইমাম বানিয়ে জামাতের আয়োজন করে দিলেন। তারপর অন্য এক রাতে আমরা আবার সেখানে যাই এবং দেখি তারা এক ইমামের পেছনে সবাই মিলে জামাতে নফল নামায পড়ছে। তখন ওমর বলে উঠলেন, "কি সুন্দর বিদআত (অর্থাৎ নতুন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আবিষ্কার) এটি; কিন্তু যে এবাদত ছেড়ে দিয়ে তারা ঘুমায় সেটা এর চেয়ে ভাল। এদ্বারা তিনি বোঝালেন রাতের শেষ ভাগের এবাদতের গুরুত্ব। তখনকার দিনে মানুষ রাতের প্রথম ভাগে এবাদত করত। " (বুখারি, Book #32, Hadith #227) ।*

উপরোক্ত হাদিস থেকে প্রতীয়মান যে, ওমর (রা:) এ নামাযে বাধা না দিলেও তিনি নিজে এ নামাযে শরীক হতেন না। তিনি ঐ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন না, পরবর্তীকালে উক্ত এলাকায় ফিরে এসে তিনি শেষের ঐ বিদআতের উক্তিটি করেন। যদিও তিনি এটিকে একটি "সুন্দর বিদআত" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু এটি আসলে কোন বিদআত নয়, বরং এটা ছিল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি সুন্নাহ'র পুনরজাগরন। কেননা, আমাদের নবী (সা:) রমযান মাসেও অন্যান্য মাসের মতই এশা নামাযের পর মধ্য রাতে ১১ রাকাত (অর্থাৎ, ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ এবং ৩ রাকাত বেতের) নফল নামায সময় নিয়ে আরামে ধীর-স্থির ভাবে নিজ বাড়িতে পড়তেন; এবং কিছুদিন জামাতের সাথেও তা আদায় করেন। জামাতটি ফরজ হয়ে যেতে পারে এই ভেবেই তিনি তা স্থগিত করেন।

> *যাইদ বিন থাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (সা:) এক রমজানে একটি ছোট ঘর বানালেন (সাইয়িদ বলেছেন, "আমার মনে হয় যাইদ বিন থাবিত বলেছেন ঘরটি খড় দিয়ে তৈরি ছিল") এবং তিনি সেখানে কয়েক রাত এবাদত করলেন, তাকে অনুসরণ করে তার কিছু অনুসারী তার পেছনে এবাদত করেন। নবী (সা:) যখন এটা টের পেলেন, তখন তিনি বসে রইলেন। পরদিন সকালে তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি দেখেছি এবং বুঝেছি তোমরা কি করেছ। তোমাদের উচিত এ নামায বাসায় পড়া, কেননা বাধ্যতামূলক ফরজ নামায ছাড়া (যা জামাতে পড়তে হয়) বাসার নামায (অর্থাৎ নফল নামায) হচ্ছে উত্তম নামায।" (বুখারি, Book #11, Hadith #698, এবং Book #21, Hadith #229)*

এবিষয়ে আরও অনেক সহিহ হাদিস পাওয়া যায় - বুখারি Book #73, Hadith #134; Book #92, Hadith #393; Book #32, Hadith #229 হাদিসগুলো দেখে নিন।

আমার জানা মতে এই একটি বিদআত ইসলামের প্রথম যুগে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং এর প্রচলন ঘটে, তাও এটা ওমর (রা:) কারনেই। কেননা, একমাত্র ওনার বিজ্ঞময় কথার আল্লাহ্ এবং তার রাসুল (সাঃ) গুরুত্ত দিতেন। তার পরামর্শেই হিজাব ফরজ হয় এবং আজানের প্রচলন হয়। এ কারনে অনেকে ওমর (রা:) কে ভয়ও পেতেন। পরবর্তীকালে তার কথাতেই কোরআন শরীফ লিখিত আকারে বিতরন করার পরামর্শ তিনিই আবু বকর (রাঃ) কে দেন।

ওমর বিন আল-খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমার প্রভু আমার সাথে তিনটি বিষয়ে একমত হয়েছেনঃ ১। আমি বললাম, "ও আল্লাহ্‌র রাসুল, আমার মনবাশনা হয় যে আমরা ইব্রাহীম (আঃ) এর এবাদতের জায়গা আমাদের এবাদতের জায়গা হিসেবে পাই"। অতপর আল্লাহ্‌র অহি নাজেল হলঃ "যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। (২:১২৫)"। ২। মহিলাদের হিজাব সম্পর্কে যখন বললাম, "ও আল্লাহ্‌র রাসুল, আমার মনবাশনা হয় যে আপনি আপনার বিবিদেরকে পর পুরুষ থেকে পরদা এবং হিজাব করার আদেশ দেন কেননা ভাল এবং মন্দ লকজন তাদের সাথে কথাবার্তা বলে"। অতপর, হিজাবে এবং পর্দার আয়াতগুল নাজিল হয়। ৩। যখন নবী (সাঃ) একজন স্ত্রী সবাইকে নিয়ে নবীর (সাঃ) বিরোধিতা করল, তখন আমি তাদের বললাম, "যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।" আমার কথাগুলো হুবহু আয়াত হিসেবে হাজিল হয় (৬৬:৫) এ"। (বুখারি, Book #8, Hadith #395)

আমাদের ইসলামী ফাউন্ডেশনকে মনযোগী হতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে কিভাবে এ জাতিকে সঠিক ইসলামে জাগরিত এবং পরিচালিত করা যায়। আরও যত অনুবাদের কাজ বাকী আছে, সেগুলোতে হাত দেয়া দরকার যাতে আমাদের ভাষায় ইসলামী জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটে। তারা অবশ্য ইসলামী ফাউন্ডেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউট নামে একটি নতুন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে যেখানে নিয়মিত আরবী ভাষা শেখানো হবে; সেটা হলে ভালই হবে। আরবী ভাষা শিখতে পারলে আর অনুবাদের প্রয়োজন হবে না।

ধর্ম-নিরপেক্ষতা মানে, ধর্ম পরিহার নয়। ধর্ম-নিরপেক্ষতার নামে সেকুলারিযম ইসলাম পরিহারের ব্যাপারে উৎসাহিত করে। ইসলামে ধর্ম-নিরপেক্ষতার অর্থ হল, যারা অমুসলিম, তাদের উপর ইসলাম পালনের কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কিন্তু, মুসলমানদের উপর জোর খাটান যায়। দেশে ইসলামী শাসন কায়েম হলে, মুসলিম অমুসলিম সবাই এর আওতায় পড়বে। ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ দেখা যায় যেখানে রাষ্ট্রন ইসলামের আইন কানুন ঠিক রাখার জন্য মুসলিম শাসকেরা ভণ্ড মুসলিমদের শাস্তি দিত।

শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে কোন রাষ্ট্র ইসঠিকভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়। একজন মুসলমান ইসলামে বিশ্বাস আনার পর ইসলামী আইন মেনে চলবে এটাই ধরে নেয়া স্বাভাবিক। অন্যথায় সে মুসলমানই নয়। মুসলমানেরা যা খুশি তাই করতে পারেনা। আমাদের ধর্ম-মন্ত্রনণালয়েএবং ইসলামী ফাউন্ডেশনে সঠিক ইসলাম জানা উপযুক্ত লোক না বসালে কোন ফায়দা হবেনা; উল্টাপাল্টা নিয়ম প্রথা চলতেই থাকবে এদেশে, আর দেশের মানুষ থাকবে ভুল এবং বিভ্রান্তিতে।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলমান জন্ম থেকে মুসলিম হওয়াতে (অর্থাৎ মুসলিম ঘরে জন্মানোতে) কলেমা তাইয়েবার মর্ম বোঝেনা। কিন্তু মুসলমান হিসেবে আমাদের এর অর্থ পুরপুরি বোঝা উচিত; কেননা এটাই মুসলমান হওয়ার পূর্বশর্ত। প্রত্যেক মুসলমানকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয়, *"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, এবং মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর প্রেরিত রসুল এবং নবী।"* শুধু উচ্চারণ বা বলেই খালাস নয়, এটা অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে এবং ইসলামের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে। তারপরেই মুসলমান হবার বিষয়টি আসে। এ বিশ্বাস না থাকা পর্যন্ত কেউ মুসলমানই নয়। কলেমা তাইয়েবাকে আল্লাহ্ তালা একটি বলিষ্ঠ উত্তম বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন -

> *"তুমি কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছেন? **কালেমা তাইয়েবা একটি পবিত্র বলিষ্ঠ উত্তম বৃক্ষ যেন।** এর মূল (মাটির) গভীরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং এর শাখা-প্রশাখা মহাশূন্যে (বিস্তীর্ণ)। এটি সব সময় তার আল্লাহ্ - মালিকের আনুমতিক্রমে স্বীয় ফল প্রদান করতে থাকে। (সুরা ইব্রাহীম- ১৪:২৪ ও ২৫)।*

সুরা ইব্রাহীম মূলত কোরানের একটি ঈমান বিষয়ক অধ্যায় । উপরল্লেখিত আয়াত দুটি মৌলানা আব্দুর রহীম এর কোরানের বাংলা আনুবাদ যা খাইরুন প্রকাশনি কর্তৃক প্রকাশিত থেকে নেয়া। হাফেয মুনির উদ্দিন আহমেদ এর বাংলা কোরানের অনুবাদেও একই অনুবাদ পাওয়া যায়। বাকি সব অনুবাদেই "কলেমা তাইয়েবার" এর অর্থ "পবিত্র বাক্য" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। এতে করে এই আয়াতের মূল বিষয়টিই হারিয়ে গেছে। অথচ, এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়! এ জন্য কারো অনুবাদের উপর ভরসা করলে ভুল বোঝার এবং মূল অর্থ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ।

ইব্রাহীম সুরার আয়াতে আয়াতে ইমানের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে । কলেমা তাইয়েবার ওপর মরহুম মৌলানা আব্দুর রহীম চমৎকার একটি বই লিখে গেছেন যা

আমাদের প্রত্যেকের মনোযোগের সাথে পড়ে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। কেননা, এটিই আমাদের ইমানের সর্ব প্রথম এবং সর্ব প্রধান বিষয়। এখানে বোঝার এবং আমলের কোন গণ্ডগোল থাকলে সব এবাদত এবং প্রচেষ্টাই বৃথা ।

মুসলিম সমাজে নামাজ কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা জরুরী ; কেননা এই নামাজই বলে দেয় কে মুসলিম আর কে অমুসলিম।

> *আবু যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহ কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর নবী (সা:) বলতেন, "বেনামাজি হচ্ছে একজন বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী (বা বহু রবে বিশ্বাসী) মানুষের মধ্যবর্তী অবস্থা।" (মুসলিম, Book #001, Hadith #0146)*

একজন মুসলমান নামাজ পড়বে এটাই স্বাভাবিক, না পড়াটা অস্বাভাবিক। সবাই একসাথে কাজের ফাঁকে ওয়াক্তের সময় জামাতে নামাজ পড়া কঠিন কিছু নয়। নামায মসজিদে গিয়ে জামাতে পড়ার তাগিদ আছে।

> *নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ... তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (সূরা আত তাওবাহ - ৯:১৮, ১০৮)*

> *ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (সা:) বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি মূলনীতির উপর: ১। প্রকাশ এবং শিকার করা যে আল্লাহ্ ছাড়া এবাদতের উপযুক্ত আর কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা:) হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল। ২। নিয়মিতভাবে আনুগত্যের সাথে এবং সঠিকভাবে জামাতে ফরজ নামায আদায় করা। ৩। বাধ্যতামূলক সাদাকাহ - যাকাত আদায় করা। ৪। হজ্জ পালন করা। ৫। রমযান মাসে রোজা রাখা। (বুখারি, Book #2, Hadith #7)*

একা নামাজ আদায় করলে নামাজ নষ্ট হতে পারে, আর আদায় হয়ে গেলেও সওয়াব কম হয়। জামাতে নামাজ পড়ার সুবিধা হল, যেকোনো একজনের নামায শুদ্ধ হোলেই সবার নামায শুদ্ধ এবং কবুল হয়ে যায়। জামাতে নামাজ পরলে ২৫ গুন বেশি সওয়াব হয়।

> *আবু সাইদ আল-খুদ্রি (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বলেছেন, "ফরজ নামায একাকী আদায় করার চেয়ে জামাতে আদায় করলে পঁচিশ গুণ বেশি উত্তম। "(বুখারি, Book #11, Hadith #619)*

যেখানে নিয়মিত ইমাম নেই সেখানে শুধু দুজন হলেই একজনকে ইমাম বানিয়ে জামাত পড়া যায়। এমতাবস্থায়, হাদিসে আছে সেই দুজনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে ইমামের দায়িত্ব নিতে। যত বড় জামাতে নামায আদায় করা যায় তত ভাল।

> *মালিক বিন হুআইরথ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: দুইজন লোক যাত্রা শুরু করার আগে নবী (সা:) এর সাথে দেখা করতে এলে তিনি তাদের বললেন, "ভ্রমণে থাকাকালীন নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান এবং একামত দিও এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যে সে নামাজের ইমাম হবে। "(বুখারি, Book #11, Hadith #603 এবং Book #11, Hadith #627)*

কোন বিশেষ কারণ ছাড়া নামায বাদ দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু, কোন কারণে নামাজ বাদ পরে গেলে সে নামাজ প্রথম সুযোগে (কাজা) পরে নেয়া যায়।

> *আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত: "আল্লাহর রসুল (সা:) যখন বেদনা বা অন্য কোন কারণে রাতের নামায বাদ দিতেন, সেই বারো রাকাত নামায তিনি পরেরদিন সকালে পড়তেন। "(মুসলিম, Book #004, Hadith #1627)*

তবে বেতেরের নামাজ কাজা হয়না। নবী (সা:) যুগে বেতের সাধারণত এক রাকাত পড়া হত, কিন্তু পরবর্তীতে তিন রাকাত পড়ার প্রচলন শুরু হয় যাতে কোন দোষ নেই, কেননা কোন কোন হাদিসে পাওয়া যায় যে তিনি কখনও কখনও ৩, ৫, ৭ এমনকি ৯ রাকাতও বেতের পড়েছেন। নির্ধারিত নামাযের অতিরিক্ত সব নামাজই নফল বলে গণ্য হবে যা কিনা নামাযের হিসাবের দিনে কমতি নামাজগুলো পূরণ করবে। অতএব, বেশি নামায পরা ভাল।

মসজিদে নামায পড়ার কিছু আদবের দিকে খেয়াল রাখা দরকার। যেমন, কারো ঘাড়ের ওপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে না যাওয়া; নামাজির সামনে দিয়ে সুতরা (অর্থাৎ প্রতিবন্ধক) না

থাকলে হেটে না যাওয়া; উচ্চ স্বরে কথা না বলা; নামাযের সময় কাতার সোজা করে গায়ে গা এবং পায়ে পা লাগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, ইমাম সুরা ফাতেহা পড়া শেষ করলে জোরে "আমীন" বলা, ইত্যাদি।

> *আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত: একদা একামত হওয়ার পর নবী (সা:) আমাদের দিকে ঘুরে দাড়িয়ে বললেন , "তোমাদের দাঁড়ানোর সাড়ি সোজা কর এবং গায়ে গা লাগিয়ে দাড়াও, আমি কিন্তু তোমাদের আমার পেছন থেকেও দেখতে পারি। " (বুখারি, Book #11, Hadith #687)*

> *আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বলেন, "তোমাদের নামাযের সারি সোজা কর, আমি আমার পেছনে সব দেখতে পারি। " আনাস যোগ করলেন, "আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং পায়ে পা মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়াতাম। " (বুখারি, Book #11, Hadith #692)*

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (সা:) বলেন, "যখন ইমাম বলেন, "সামিয়াল-লাহু-লিমান হামিদাহ" , তোমারা বল, "আল্লাহুম্মা রাবান্না লাকাল হামদ। " তোমাদের কারো এই বলা যদি ফেরেশতাদের বলার সাথে মিলে যায়, তাহলে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। " (বুখারি, Book #12, Hadith #762)*

আমরা যখন আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাই তখন নামায পড়ি; আর যখন আল্লাহর কথা শুনতে চাই তখন কুরআন তেলাওয়াত করি। অতএব, একজন নামাযীকে নামাযে থাকা অবস্থায় ধরে নেয়া হয় যে সে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথন করছে, এ অবস্থায় নামাযীর সামনে দিয়ে হেটে যাওয়া চরম বেয়াদবির সামিল। সেজন্য নামাযীর সামনে সুতরা রেখে তারপর হাঁটাচলা করা উচিত । জুতা বা ব্যাগ বা ইট দিয়ে সুত্রার কাজ হয়না ।

> *ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) ঈদের জামাতে ওনার সামনে সুতরা হিসেবে একটি ছোট তীর (হারবা) মাটিতে খাড়া করে গাড়তেন এবং ঐ তীরকে সামনে রেখে ইমামতি করতেন। ভ্রমণকালেও তিনি একই ভাবে সুতরা ব্যবহার করতেন। নবীর (সা:) এই শিক্ষা অনুসরণ করে নবীর পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ এ প্রথা বজায় রাখেন। (বুখারি, Book #9, Hadith #473)*

আবু সালিহ আস-সাম্মান (রাঃ) থেকে বর্ণিত: এক শুক্রবার আমি আবু সাইদ আল-খুদ্রি কোন একটা বস্তুকে সুতরা হিসেবে সামনে রেখে নামায রত অবস্থায় দেখলাম। বানি আবি মুয়াইত থেকে এক যুবক তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আবু সাইদ তাকে বুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। উপায়ন্তর না দেখে সে আবার যাওয়ার চেষ্টা করলে আবু সাইদ আরও জোরে তাকে বাধা দেন। তখন সেই যুবক আবু সাইদকে গালাগালি করে মারওয়ানের কাছে গিয়ে আবু সাইদের নামে অভিযোগ করে; আবু সাইদও তার সাথে তার কাছে যায় এবং মারওয়ান জিজ্ঞেস করে, "ও আবু সাইদ! তোমার এবং তোমার ভাইয়ের ছেলের সাথে কি হয়েছে?" আবু সাইদ বললেন, "আমি আমার নবীকে বলতে শুনেছি, "কেউ যদি তোমার নামায রত অবস্থায় সুতরা থাকা সত্বো ওতোমার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে বাধা দাও, তার পরও যদি চেষ্টা করে তাহলে তার বিরুদ্ধে জোর খাটাও কেননা সে এক শয়তান। "(বুখারি, Book #9, Hadith #488)

আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সঠিক সুতরা হতে পারে একটি দণ্ডায়মান লাঠি যার উচ্চতা একজন নামাযীর বসা অবস্থার উচ্চতা। সেরকম কোন কিছু পাওয়া না গেলে সম উচ্চতার কিছু ব্যবহার করলে চলে; যেমন, নবী (সা:) অনেক সময় উট বা উটের আস্তাবল কে সুতরা হিসেবে ব্যাবহার করেছেন। অনেক সময় একজন নামাযীর নামায শেষ হওয়ার পরও তিনি বসে থাকেন অন্য নামাযীর সামনে সুতরা হিসেবে যাতে করে অন্যরা চলাচল করতে পারে। পরে সেই নামাযীর নামায শেষ হলে তিনিও উঠে চলে যান।

অন্যদিকে, সুরা ফাতিহা পড়ার শেষে সবাই মিলে জোরে "আমীন" বললে সেই আমীন যদি ইমাম এবং এবং ফেরেশতাদের আমিনের সাথে এক হয়ে যায়, তাহলে তার সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব, আমাদের উচিত একসাথে আমীন বলার চেষ্টা করা। তবে হ্যাঁ, দিনের নামাযগুলো (জুম্মা ছাড়া) যেহেতু নিম্ন স্বরে পড়া হয়, সেখানে একসাথে জোরে আমীন বলার সুযোগ নেই।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বললেন, "তোমরা সুরা ফাতেহা পাঠ শেষে "আমীন" বল; কেননা যখন ইমাম এবং তোমাদের কারো "আমীন" ফেরেশতাদের "আমীন" এর সাথে এক হয়ে যায় তখন তার অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। " ইবনে শিহাব বলেন, "আল্লাহর নবী (সা:) "আমীন" বলতেন। "(বুখারি, Book #12, Hadith #747)

আমাদের নবী (সা:) শুধু ফরজ নামাজগুলো মসজিদে পড়তেন; এবং নফল নামাজ বাসায় পড়তেন। যেসব নফল নামায তিনি নিয়মিত পড়তেন তা আমাদের জন্য আজ সুন্নত নামায। অতএব, আমাদেরও উচিত নফলের সাথে সুন্নত নামাজও বাসায় পড়া। আমাদের বাস গৃহকে কবরে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন তিনি। তাই কিছু নামাজ বাসাতে পড়া উচিত। লক্ষ্য করলে দেখবেন যে মক্কা-মদিনা বাসীরা আজো শুধু ফরজ নামাজই মসজিদে জামাতে আদায় করে বাসায় চলে যায় বাকি নামাজগুলো পড়ার জন্য; সব নামায মসজিদে পড়েনা। এটাই নবীর শিক্ষা।

> *ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বলেন, "তোমরা কিছু নফল নামায বাসায় পড়, তোমাদের বাসগৃহকে কবরে পরিণত করোনা । "(বুখারি, Book #8, Hadith #424)*

আমাদের দেশে মুসলমানদের ধারনা যে শুধু জুম্মা নামায মসজিদে জামাতের সাথে পড়তে হয় এবং অন্য ফরজ নামায বাসায় পড়লেও চলে - এ ধারনা ভুল।

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বললেন, "কোন সন্দেহ নাই, আমি বহুবার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গিয়েছিলাম যে কেউ ফরজ নামাযের জামাতে একামত দেয়াকালিন সময় আমি যারা নামাযে আসেনা তাদের বাড়ি গিয়ে তাদের সহ তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেই। "(বুখারি, Book #41, Hadith #602)*

> *আবু মাবাদ (রাঃ) (ইবনে আব্বাস এর মুক্ত ক্রীতদাস) থেকে বর্ণিত: ইবনে আব্বাস আমাকে বলেছেন, "নবীর (সা:) এর সময় জামাতের নামায শেষে উচ্চ স্বরে আল্লাহর প্রশংসা (যিকির) করার প্রচলন ছিল। আমি যখনই যিকির শুনতে পেতাম, বুঝতাম যে নামাজের জামাত শেষ হয়ে গেছে। " (বুখারি, Book #12, Hadith #802)*

বাংলাদেশে কোন কোন মসজিদে এর প্রচলন দেখা যায়। যেমন, আমি একবার গ্রিন রোড থেকে বশিরুদ্দিন রোডে ঢোকার সময় হাতের বাঁয়ে যে ডরমিটরি জামে মসজিদটি পরে সেখানে জামাত শেষে যিকির হতে শুনেছি। অবশ্য সেটা নিয়মিত হয় কিনা তা আমার জানা নেই।

নবীর (সা:) যুগে আযান এবং একামতের মধ্যে পার্থক্য ছিল। আযান ডাকা হত দুবার করে এবং একামতে একবার। আমাদেরও সেটাই অনুসরণ করা দরকার। এ বিষিটি

হাদিসেও উল্লেখ আছে। একামতে প্রথম ও শেষের "আল্লাহু আকবর" এবং "কাদকামাতিস-সালাহ" দুবার ছাড়া বাকি সব একবার বলতে হয়।

> *আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: বিলাল কে হুকুম করা হয়েছিল আযানে সব শব্দ দুবার করে উচ্চারণ করতে এবং একামতে একবার করে শুধু "কাদ-কামাত-ইস-সালাত" ছাড়া। "(বুখারি Book #11, Hadith #579; আরও দেখুন Hadith #577, Hadith #580 এবং Hadith #581 নং হাদিস সমূহ)।*

শুধু মাত্র বুখারি শরীফেই এর একাধিকবার উল্লেখ পাওয়া যায়, আর অন্যান্য হাদিসে তো আছেই। আমি যখন আমাদের অফিসের বিল্ডিং এর নামায ঘড়ের ইমাম সাহেবকে প্রশ্ন করলাম কেন আমরা এই হাদিসটি অনুসরণ করিনা; তিনি জানালেন যে, উভয় প্রথাই গ্রহণযোগ্য। আমি যখন ওনার কাছে দলিল বা প্রমাণ চাইলাম, তিনি আমাকে ডঃ শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল এর লেখা "নবীজীর নামায" বইটি এনে উপহার দিলেন। ভাল লেখকের বই পেয়ে আমি তা সানন্দে গ্রহণ করলাম। অতএব, প্রচণ্ড আগ্রহের সাথে আমি "ইকামত" অধ্যায়টি খুলে দেখলাম। সেখানে ১৩৯ নং পৃষ্ঠায় উপরুল্লেখিত হাদিসটি পাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু আরও পাওয়া গেল, "বিলাল (রা:) কে আযানের বাক্যগুলো দুইবার করে এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার আদেশ দেয়া হয়েছে। (সহিহ মুসলিম: ১/১৬৪)। " তারপর আরও বলা আছে, "আজান-ইকামতের সূচনাকালে বিলাল (রা:) কে এই আদেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এই নিয়ম মানসুখ হওয়ার পর তিনিও জীবনের শেষ পর্যন্ত ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলতেন। " অনুবাদক সব শব্দের অনুবাদ করলেও এই "মানসুখ" শব্দটি কেন বাদ দিলেন তো বুঝলাম না। আমি এই শব্দের অর্থ খুঁজতে গিয়ে দুটি অর্থ পেলাম ; একটি হোল "জনপ্রিয়" এবং অন্যটি "রহিত করা" । অতএব, এ থেকে যা বুঝান হচ্ছে তা হোল, শুধুমাত্র জনপ্রিয়তার খাতিরেই বিলাল (রা:) নবীর (সাঃ) দেয়া আদেশ পালন থেকে বিরত থাকলেন এবং এই চর্চাটি রহিত হয়ে গেল! এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? আর যেসব দলিল এর পক্ষে পেশ করা হয়েছে তো অনেক পরের কার "তবারি" এর লেখা থেকে; যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংশয় আছে। কে ছিলেন এই তবারি? তিনি বিশেষত একজন বর্তমান ইরান এর তাবারিস্থান এলাকার সুন্নি ইতিহাসবিদ ছিলেন (২২৪ - ৩১০ হিজরি) যার আসল নাম ছিল আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারির; যেহেতু তিনি তাবারিস্থানের অধিবাসী ছিলেন সেহেতু তার নামের শেষে আল-তাবারি যুক্ত করে তাকে আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারির আল -তাবারি বলে সকলে অভিহিত করতেন। অতএব, আমি মনে করি, একজন ইতিহাসবিদের আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে সহিহ হাদিস অবহেলা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।

উপরল্লেখিত আলোচিত বিষয়গুলোর বাস্তব প্রচলন দেখা যায় মুহাম্মাদপুর এর শাহজাহান সড়কে অবস্থিত আল-আমিন মসজিদে এবং বারিধারার জাতিসঙ্ঘ সড়কের শেষ প্রান্তে লেকের পাড়ে ১২ নং সড়কের মাথার বারিধারা মাটির মসজিদে। সেখানে সব মুসুল্লি সুন্নাহ অবলম্বনে গায়ে গা লাগিয়ে , পায়ে পা লাগিয়ে বুকের উপর হাত বেধে একেবারে সুন্নাহ মোতাবেক নামায আদায় করে থাকেন । পুরপুরি সুন্নাহ অনুসরণ করা হয় বলে এই মসজিদটি আহলে-হাদিস বা আহলে-সুন্নাহ নামেও পরিচিত। প্রতি জুম্মায় এই মসজিদে দেশের নামকরা সব বড় আলেমগণ আসেন খুতবাহ দিতে ; এনাদের অনেকেই পিস টিভি সহ বিভিন্ন ইসলামি আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। মসজিদটির সন্ধান পাওয়ার পর থেকে আমি নিজেও সেখানে নিয়মিত জুম্মা নামায আদায় করতে যাই এবং বর্তমানে মাযহাব বাদ দিয়ে সুন্নাহ এবং হাদিস মতে নামায আদায় করি । আপনারা যারা নবীর (সাঃ) পথে ফিরে আসতে চান তারা অন্তত একবার ঐ মসজিদে গিয়ে জুম্মা নামায আদায় করুন। নবীর (সাঃ) পন্থায় নামায পড়ার মজাই আলাদা। সেখানে নারীদের অর্থাৎ মুসলিমাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। আমি আশা করবো যে, আগামীতে আমাদের দেশের সব মসজিদেই এই পন্থায় নামায পড়া হবে। দেশের বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের এবং মসজিদ কমিটির সদস্যদের এ বিষয়ে মনযোগী হওয়ার আহ্বান জানাই। নবীর (সাঃ) এবাদতের পন্থায় বাঁধার কারণ না হয়ে পথটি সহজ এবং সুগম করে দিন। তাহলেই আল্লহ এবং ওনার রাসুল (সাঃ) খুশি হবেন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি অধ্যাপক মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম এর "যেভাবে নামায পড়তেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ)" বইটিও ফর্দে যোগ করে দিলাম। তবে বইটিতে কোন চিত্র নাই বলে আমি আমার পাঠকদের সুবিধার্থে সম্পুরক হাদিস সহ সংক্ষেপে দিলামঃ

মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমরা নবীর কাছে এসে বিশ দিন বিশ রাত তার সাথে ছিলাম। আমরা তখন তরুণ এবং প্রায় সমবয়সী। নবী ছিলেন খুব দয়াশিল এবং ক্ষমাশীল। তিনি যখন বুঝতে পারলেন আমাদের পরিবারের প্রতি টানের ব্যাপার, তিনি তখন আমাদের বাড়ীর এবং সেখানকার লোকদের কথা জানতে চাইলেন আমরা ওনাকে সব বললাম। তিনি তখন আমাদের যার যার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে বললেন এবং তাদের সাথে থেকে ধর্ম শেখাতে এবং ভাল কাজে আদেশ।

উপদেশ দিতে। তিনি আরও কিছু বলেছিলেন যা আমি আজ আর পরোপুরি মনে করতে পারছিনা। অতপর নবী যোগ করলেন, "তোমরা আমাকে যেভাবে এবাদত (অর্থাৎ, সালাত আদায়) করতে দেখেছ সেভাবেই তোমরা এবাদত কর এবং যখন সালাতের সময় হয় তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন আজান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যে সে সালাতে ইমামতি করবে। (*বুখারি, Book #11, Hadith #604*)

ওয়ালি ইবনে হুজুর (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি বললাম, আমি আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কিভাবে সালাত আদায় করেন তো আমি পর্যবেক্ষণ করবো। আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) উঠে দড়িয়ে কেবলা মুখি হলেন এবং আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরের সাথে তার হাত দুটি কানের সম্মুখ পর্যন্ত উঠালেন, তারপর তিনি তার ডান হাত দিয়ে বাম হাত ভাঁজ করে ধরলেন। রুকুতে যাওয়ার আগে তিনি আগের মত হাত দুটি তুল্লেন। তারপর তিনি বসলেন, বাঁ পাঁকে ভাঁজ করে তার উপর বসলেন এবং তার উরুর উপর তার বাম হাতটি রাখলেন, আর ডান হাতটি ডান উরুর উপর তর্জনীটি উঁচিয়ে রেখে বাকি আঙ্গুল গুলো গল করে ভাঁজ করে রাখলেন (বক্তা আঙ্গুল গুলো ওভাবে গোল করে ভাঁজ করে দেখালেন)। (*সুনান আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0957*) [ইংরেজিতে তর্জনীর যায়গায় elbow বা কনুই উল্লেখ আছে, যা আমার মনে হয় ভুল আনুবাদ। কারণ অন্যান্য অনুবাদে তর্জনীই বলা আছে।]

উমর বিন আল খাত্তাব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীকে বলতে শুনেছি, "নিয়তের উপর কর্মফল নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকে নিজের নিয়তের পুরস্কার পাবে। অতএব, যে দুনিয়ার সুবিধার জন্য দুর দুরান্তে যায়, অথবা বিবাহের উদ্দেশে, তার সেই যাত্রা ওইসব কারণেই।" (বুখারি, Book #1, Hadith #1)

সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত: আমার আব্বা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নবী সালাত আদায় করার সময় তার দু-হাত তার ঘাড় পর্যন্ত উঠাতেন, এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের পর। রুকু থেকে মাথা উঁচিয়ে আবার তা করতেন এবং বলতেন "সামি আল-লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।" এর পর ছেজদায় আর তিনি তা করেন নি (অর্থাৎ, হাত উঠানো)। (বুখারি, Book #12, Hadith #702), (Book #12, Hadith #703)

তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) সালাতের সময় তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ভাঁজ করে বুকের উপর বাঁধতেন। (সুনান আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0758)

আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সালাতে এদিক অদিক তাকানোর ব্যাপারে। জবাবে তিনি বলেছিলেন, "এটি একধরনের চুরি যার মাধ্যমে শয়তান একজনের সালাতের কিছু অংশ চুরি করে।" (বুখারি, Book #12, Hadith #718)

আনাস বিন মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, "ঐ সকল লোকদের কি হয়েছে যে তারা সালাত রত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে?" ওনার গলার স্বর গম্ভীর হয়ে গেল এই আলোচনার সময় এবং বললেন,"তাদের উচিত এ থেকে বিরত থাকা (সালাতের সময় আকাশের দিকে চেয়ে থাকা); অন্যথায় তাদের চোখের দৃষ্টি শক্তি কেঁড়ে নেয়া হবে।" (বুখারি, Book #12, Hadith #717)

*সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত: আমার আব্বা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নবী সালাত আদায় করার সময় তার দু-হাত তার ঘাড় পর্যন্ত উঠাতেন; **এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের পর।** রুকু থেকে মাথা উঁচিয়ে আবার তা করতেন এবং বলতেন "সামি আল-লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।" এর পর ছেজদায় আর তিনি তা করেন নি (অর্থাৎ হাত উঠানো)। (বুখারি, Book #12, Hadith #702), (Book #12, Hadith #703)*

*মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; **রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন,** তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)*

*মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; **রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে***

পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত: আমার আব্বা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নবী সালাত আদায় করার সময় তার দু-হাত তার ঘাড় পর্যন্ত উঠাতেন; এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের পর। রুকু থেকে মাথা উঁচিয়ে আবার তা করতেন এবং বলতেন "সামি আল-লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।" এর পর ছেজদায় আর তিনি তা করেন নি

(অর্থাৎ, হাত উঠানো)। (বুখারি, Book #12, Hadith #702), (Book #12, Hadith #703)

*মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, **তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত।** সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)*

*সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত: আমার আব্বা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নবী সালাত আদায় করার সময় তার দু-হাত তার ঘাড় পর্যন্ত উঠাতেন; এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের পর। রুকু থেকে মাথা উঁচিয়ে আবার তা করতেন এবং বলতেন "সামি আল-লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।" **এর পর ছেজদায় আর তিনি তা করেন নি (অর্থাৎ, হাত উঠানো)।** (বুখারি, Book #12, Hadith #702), (Book #12, Hadith #703)*

*মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। **সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে,** এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)*

*আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, "**আমাদের মুখায়ব যেমন সেজদা দেয় তেমনি আমাদের হাত দুটোও সেজদা দেয়। যখন তোমরা কেও মুখায়ব মাটিতে রাখবে সে যেন তার হাত দুটোও মাটিতে রাখে। এবং যখন ওঠায়, তখন যেন হাতও ওঠায়।**" (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0891)*

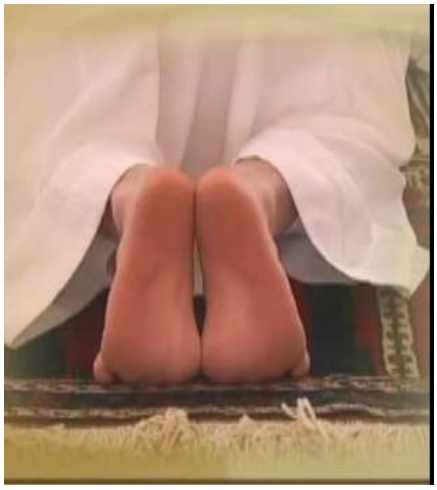

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়;

রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

ইবন আব্বাস (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্ তায়ালা নবী (সাঃ) কে আদেশ করেছেন আমাদের সাতটি অংশের উপর সেজদা করতে এবং সালাতের সময় যেন কাপড় বাঁ চুল না গুটাই। সেই অংশগুলো হলঃ কপাল (নাকের ডগা সহ), দুই হাত, দুই হাঁটু, এবং দুই পায়ের আঙ্গুল সমূহ। (বুখারি, Book #12, Hadith #773); (Book #12, Hadith #776)

আল-বারা ইবন আযিব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল-বারা আমাদের সেজদা সম্পর্কে বোঝাচ্ছিলেন। তিনি তার হাতের তালু যুগল মাটিতে রাখলেন হাঁটুর উপর ভড় করে এবং নিতম্বকে উঁচু করেলেন; আর বললেন, "এভাবেই আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) সেজদা দিতেন।" (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0895)

আইয়ুব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আবু কিলাবা বলেছেন, "মালিক বিন হুয়াইরিথ আমাদেরকে জামাতে সালাতের অন্য সময় নবী (সাঃ) এর সালাতের পদ্ধতি দেখাতেন। অতঃপর একদিন উনি উঠে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন নিখুঁত ভাবে কিয়ামের (দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত) সাথে এবং নিখুঁত ভাবে রুকুতে গেলেন, এর পর তিনি তার মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইলেন।" আবু কিলাবা যোগ করলেন, "মালিক বিন হুয়াইরিথ তার ঐ উপপাদনে আমাদের শায়খ আবু ইয়াযিদের মত সালাত পড়লেন।" আবু ইয়াযিদ দ্বিতীয় সেজদার পর মাথা তুলে উঠে দাঁড়াবার আগে কিছুক্ষন বসে থাকতেন। (বুখারি, Book #12, Hadith #767)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার

*পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন **এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন;** শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)*

*মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, **এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী।** দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)*

*ওয়ালি ইবন হুযুর (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ **আমি নবীকে (সাঃ) সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত গুলো মাটিতে রাখার আগে হাঁটু যুগল মিটিতে রাখতে দেখেছি। এবং যখন উনি উঠে দাঁড়ান, আগে হাত দুটো উঠিয়ে তারপর হাঁটু গুলো উঠান।** (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0837)*

আবু হুরায়রাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি সালাতে উটের মত হাঁটু গেঁড়ে বস? (অর্থাৎ, হাত রাখার আগে হাঁটু রাখা)। (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0840)

[নোট: উপরোল্লিখিত হাদিস দুটি পরস্পর সাঙ্ঘরশিক। সম্ভবত নবী (সাঃ) উভয় পন্থায়ে সালাতে সেজদা করতেন। ব্যাগতিগতভাবে আমি দ্বিতীয় পন্থাটি বেছে নিয়েছি কেননা আমি খেয়াল করে দেখেছি যে হাঁটুর বদলে হাতের উপর শরিরের চাপ নিতে সহজ হয়।]

সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত: আমার আব্বা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নবী সালাত আদায় করার সময় তার দু-হাত তার ঘাড় পর্যন্ত উঠাতেন; এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের পর। রুকু থেকে মাথা উঁচিয়ে আবার তা করতেন এবং বলতেন "সামি আল-লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।" এর পর ছেজদায় আর তিনি তা করেন নি (অর্থাৎ, হাত উঠানো)। (বুখারি, Book #12, Hadith #702)

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ ইমরান বিন হুসাইন এবং আমি আলী বিন আবি তালিব (রহঃ) এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। আলী যখন সেজদায় যান, তখন তিনি তাকবীর বলেন, যখন মাথা তলেন তখন আবার তাকবীর বলেন এবং যখন তিনি তৃতীয় রাকাতে যান আবারো তাকবীর বলেন। সালাত শেষে ইমরান আমার হাত ধরে বললেন, "ইনি (অর্থাৎ, আলী) আমাকে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সালাতের নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিলেন।"

অথবা, বললেন, "উনি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসরণে সালাতের নেতৃত্ব দিয়েছেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #753)

*সাহাল বিন সাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ **মানুষজনকে সালাতে তাদের ডান হাত বাম হাতেরপ্রকোষ্ঠে রাখার জন্য আদেশ করা হয়েছে।** আবু হাযিম বলেন, "আমি নবীর (সাঃ) এই আদেশের কথা জানতাম।" (বুখারি, Book #12, Hadith #707)*

*তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) **সালাতের সময় তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ভাঁজ করে বুকের উপর বাঁধতেন।** (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0758)*

*ইয়াহহিয়া (রহঃ) থেকে আমি শুনেছি, উনি মালিক, ইবন শিহাব, উর্ওয়া ইবন আয যুবায়র, আব্দুর রাহমান ইবন আল ক্বারি থেকে শুনেছেন যে উমার ইবন আল খাত্তাব (রহঃ) মিনবার থেকে লোকজনকে **তাশাহহুদ** সম্পর্কে শেখাচ্ছিলেন, "বল, সব শুভেচ্ছা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ সব আল্লাহ্‌র। সুন্দর বাক্য এবং সালাত আল্লাহ্‌র জন্য। নবীর প্রতি সালাম তার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র ক্রিতদাশদের উপর যারা সালিহুন শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তার ক্রীতদাস এবং রাসুল।" **"আত-তাহিয়াতু লিল্লাহ, আয-যাকিয়াতু লিল্লাহ, আত-তায়িবাতু ওয়াস সালাওয়াতু লিল্লাহ। আস -সালামু আলায়কা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস -সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। আশ-হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া***

রাসুলুহ।“ (মালিক মুয়াত্তা, Book #3, Hadith #3.14.56); (Book #3, Hadith #3.14.57); (Book #3, Hadith #3.14.58); (Book #3, Hadith #3.14.59)

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রহঃ) এর বাবার কর্তৃত্বের উপর কথিত, যখন আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) দুয়া অথবা মিনতির জন্য বসতেন (অর্থাৎ, তাশাহহুদ), তিনি তার ডান হাত তার আন উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন, এবং তার ডান হাতের তর্জনী উঠিয়ে ইঙ্গিত করতেন, এবং বাকি আঙ্গুলি গুলো ভেতরে ভাঁজ করে তার বুড় আঙ্গুল দিয়ে চেপে রাখতেন, এবং তার বাম তালু দিয়ে বাম পায়ের হাঁটু ধেকে রাখতেন। (মুসলিম, Book #004, Hadith #1202)

ইবন উমার (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ যখন আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) তাশাহহুদের জন্য বসতেন তখন তিনি তার বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রাখতেন , এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর, এবং তিনি তার ডান হাতের তর্জনীটি উঠাতেন, এবং এভাবেই তিনি দুয়া ও মিনতি করতেন, এবং তার বাম হাতটি লম্বা করে তার হাঁটুর উপর রাখতেন।...(মুসলিম, Book #004, Hadith #1203); (Book #004, Hadith #1204)।

আব্দুল্লাহ ইবন আয যুবায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) তাশাহহুদ এর শেষের দিকে তার তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিত করতেন এবং তা তিনি নাড়াতেন না।(আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0984)

আবু হুরাইরা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদের শেষ অংশটি পড়া শেষ করবে, সে যেন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে চারটি (পরিক্ষা) থেকে নিরাপত্তা চায়; সেগুলো হোল, দজখের আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মরণোত্তর বিপদ আপদ

থেকে, এবং মাসিহ-আদ-দাজ্জালের (খ্রীষ্টশত্রু) নষ্টামি থেকে। এই হাদিসটি আল-আউযাই থেকেও বর্ণিত একই ধারাবাহিকতায় কিন্তু শব্দে সামান্য পরিবর্তন আছেঃ "যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ শেষ করল" তিনি "শেষ অংশটি" শব্দগুল উল্লেখ করেন নি।" (মুসলিম, Book #004, Hadith #1219)

আমির বিন সাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) কে ওনার ডান দিকে এবং ওনার বাম দিকে ফিরে তাসলিম (সালাম ফেরানো) উচ্চারণ করতে শুনেছি এবং সে সময় আমি তার সাদা গাল যুগল দেখতে পেয়েছি। (মুসলিম, Book #004, Hadith #1208)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

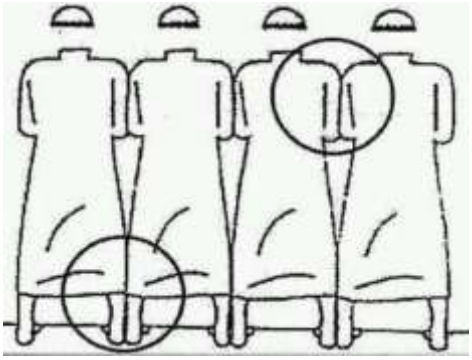

আনাস বিন মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের সালাতের সারিগুল সোজা করো কেননা আমি আমার পেছনে দেখতে পাই।" আনাস যোগ করলেন, "আমরা সকল সাহাবীরা ঘারের সাথে ঘাড় এবং পায়ের সাথে পা মেলাতাম।" (বুখারি, Book #11, Hadith #692)

আনাস বিন মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের সালাতের কাতার সোজা করো কেননা নিখুত এবং শুদ্ধ সালাতের জন্য এটা অপরিহার্য।" (বুখারি, Book #11, Hadith #690)

আবু হুরাইরা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, "ইমামকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। অতএব তার সাথে কোন বাতিক্রম করো না , সে যখন রুকুতে যায় তোমরাও যাও, এবং বল,"রাব্বানা লাকাল হামদ' যদি সে বলে, "সামিয়া-ল-লাহু লিমান হামিদা'; সে যদি সেজদায় যায়, তাকে অনুসরণ কর সেজদায় যাও, এবং সে যদি বসে সালাত পরে, তোমরা সবাই বসে সালাত পড় একসাথে, এবং সালাতের কাতার (সারি) সোজা রাখ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সোজা কাতার রাখা সালাত শুদ্ধ ও নিখুত করার একটি বিষয়।" (হাদিস নং ৬৫৭ দেখুন)। (বুখারি, Book #11, Hadith #689)

আবু ওয়ালি (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ হুধাইফা বলেছেন, "আমি একজনকে দেখলাম যে সে নিখুতভাবে রুকু এবং সেজদা করছে না। সে যখন সালাত শেষ করল , আমি তাকে বললাম যে তার সালাত হয়নি।' আমার মনে হয় হুধাইফা যোগ করলেন, "তোমার যদি এ অবস্থায় মৃত্যু হয়, তাহলে তোমার মৃত্যু হবে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নিয়মের বাইরে অন্য কোন ঐতিহ্যে।" (বুখারি, Book #12, Hadith #772)

[স্বীকারোক্তিঃ এই লেখার বেশীরভাগ চিত্রই "Pray as you have seen me pray" নামক ভিডিও থেকে নেয়া যা কিনা ইউটিউব এর www.youtube.com/watch?v=jNoiLHwH5Fg লিঙ্কে পাওয়া যাবে এবং সকল হাদিস সমূহ Search Truth সাইট - http://www.searchtruth.com/ থেকে নেয়া।]

সাত বৎসর থেকে শুরু করে বাচ্চাদের নামায শেখাবার তাগিদ দিয়েছেন আমাদের নবী (সা:) যা দশ বৎসর থেকে পূর্ণতা লাভ করা উচিত নিয়মিত ভাবে। কিন্তু আমরা আর আমাদের বাচ্চাদের নামায রোযা শেখাই না। তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে কোন কিছুই শেখাই না। তাহলে ওরা কি করে মুসলমান হবে? শুধু "আসসালামু-আলাইকুম" আর

“খোদা হাফেয” বললেই কি মুসলমান হওয়া যায়? শুধু মুসলমান নামধারী হলেই কি মুসলমান হওয়া যায়?

> *আস-সাবুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বলেন, “ছেলেরা যখন সাত বৎসরে উপনীত হয় তাদের নামায পড়তে হুকুম কর; আর দশ বৎসর বয়স হলে তাদের প্রহার কর যদি তারা নামায পড়তে না চায়” । (সুনান আবু দাউদ Book #2, Hadith #0494)*

ইসলামে মাতাপিতার প্রতি দায়িত্বের হুকুম হোল,

> *তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও-যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়-আপনজনের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:২১৫)*

> *আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক কোরো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিত জনকে। (সূরা আন নিসা - ৪:৩৬)*

> *তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত কোরো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বোলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা। (সূরা বনী ইসরাঈল - ১৭:২৩)*

> *পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। (সূরা মারইয়াম - ১৯:১৪)*

কোরআন আমাদের মাতাপিতার জন্য দোয়া করতে শেখায়,

> *হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (সূরা ইব্রাহীম - ১৪:৪১)*

তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা নমল - ২৭:১৯)

হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে-তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। (সূরা নূহ - ৭১:২৮)

এখন বলুন, আমরা যদি আমাদের বাচ্চাদের ইসলাম বাদ দিয়ে যদি অন্য সব কিছুই শেখাই তারা কি আমাদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন নিজে থেকে করবে? ইসলামে বিশ্বাসী হয়ে তারা মুসলিম হলে তারা তাদের দায়িত্ব অবহেলা করবে না। আশেপাশে একটু খেয়াল করে দেখুন এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে তাদের ছেলেরা তাদের মাতাপিতার কোন খোঁজ খবর রাখেনা মাদার' স ডে বা ফাদার' স ডে ছাড়া। কেন? কেননা তারা ইসলামে দীক্ষিত নয় বলে। তারা জানেই না যে মাতাপিতার দায় ভার নেয়া তাদের কর্তব্য। অথচ, ইসলামে মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব আমাদের জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ!

আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আমি নবিজিকে (সা:) জিজ্ঞেস করলাম, "আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কোনটি?" তিনি জবাবে বললেন, "ঠিক সময়ে নামায পড়া। " আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?" তিনি বললেন, "মাতাপিতার প্রতি সৎ এবং দায়িত্ববান হওয়া" , আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে শরিক হওয়া " আব্দুল্লাহ আরও যোগ করলেন, "আমি ঐ পর্যন্তই জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি আরও জিজ্ঞেস করতাম হয়ত তিনি আরও বলতেন। "(বুখারি, Book #10, Hadith #505)

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হলেও আমাদের দেশে নামায এখনও প্রতিষ্ঠিত বা কায়েম হয়নি। আমাদের স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলতে কিংবা অফিস-আদালত, শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বা সামরিক বাহিনীতে কোন জায়গাতেই নামাযের কোন তাগিদ বা প্রচলন নেই। বিভিন্ন যায়গাতে দেখা যায়, নামাযের ওয়াক্ত পার হয়ে যায় অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতা চলতেই থাকে, নামাযের জন্য কোন

বিরতি দেয়া হয়না, কেউ নামাযের জন্য উঠেও না। অথচ, উক্ত অনুষ্ঠানের হয়ত শতকরা ৯৯ ভাগই মুসলিম! এই হচ্ছে এদেশের মুসলমানদের হাল অবস্থা।

কুরআনে পরিষ্কার বলা আছে মুসলমান মেয়েদের হিজাব পড়তে হবে। অথচ এদেশের মুসলিম নারীরা একেবারেই হিজাব বিমুখ। তারা মনে করে হিজাব পরাটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের এবং পছন্দের বিষয়। ইসলামে তাদেরকে তাদের রূপ গুণ অন্য অপরিচিত পুরুষদের বিনোদনের জন্য দেখিয়ে বেড়াবার অনুমতি দেয়া হয়নি।

> *ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রী নলোকঅধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পাদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা আন-নূর - ২৪:৩১)*

তারা নিজেদের পুরুষের কুদৃষ্টি থেকে নিরাপদে রাখবে, এটাই আল্লাহতালার নির্দেশ। কিন্তু তারা নির্বিচারে এই নির্দেশ অমান্য করে চলেছে। তারপরেও তারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করতে চায়। আমাদের মুসলিম পুরুষ সমাজও এমন যে তারা তাদের পরিবারের মেয়েদেরকে হিজাব পড়ার কোন তাগিদ দেন না। এবং এ বিষয়ে উদাসীন হয়ে তারা নিজেরাও গুনাহর ভাগীদার হয়ে যান। "নারী স্বাধীনতার" নামে যে সেকুলার ষড়যন্ত্র চলছে, সেই ফাঁদে আমাদের বেশীরভাগ নর-নারী পা দিয়ে রেখেছেন। অথচ, এই নারী স্বাধীনতার মূল লক্ষই হোল নারীদের তাদের ঘরের নিরাপদ বেষ্টনী থেকে বের করে এনে হেস্ত-ন্যস্ত করা। নারীরা হচ্ছে সভ্যতার চাবিকাঠি; ওদের নষ্ট করা মানেই পুরো সভ্যতা নষ্ট করা। নারী স্বাধীনতার পরিণতি হোল - সমাজে তাদের পুরুষদের সাথে সরাসরি অসম প্রতিযোগিতা করা, ঘর-সংসারে অমনোযোগী হওয়া, পরিবার-পরিজনদের সাথে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাওয়া, অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়া, ইত্যাদি।

আমি যুক্তরাষ্ট্রেযছাত্র থাকাকালীন একবার একটি ক্লাসে "বিমিশ্রতা" (Promiscuity) নিয়ে আলোচনার সময় আমি আমার শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করি, "এতে সুবিধাটা কি?" উত্তরে তিনি বলেন, "বিমিশ্রতা থাকলে আমারা যার সাথে খুশি তার সাথে সম্পর্ক গড়তে পারি কোন

রকম বাধা-নিষেধ বা লজ্জাবোধ ছাড়া। " ভাবলাম, সত্যিই তো তাই! আমাদের লজ্জা-শরম বর্জন করলেই তো আমারা যা খুশি তাই করতে পারি!" বড়ই জঘন্য এক চক্রান্ত!

নারীদের ব্যাপারে আমাদের পুরুষদের আরও দায়িত্বশীল হওয়া দরকার। আল্লাহতালা পুরুষদের এক ডিগ্রি বেশি দায়িত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন নারীদের চেয়ে, এবং তা নারীদের যত্ন নেয়ার ব্যাপারেই।

> *আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:২২৮)*

মুসলিম পুরুষদের উপর দায়িত্ব দেয়া আছে যে তারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের পরিবারের নারীদের দেখা শোনা করবে। কন্যা থাকা কালীন বাবার দায়িত্ব; বোন অবস্থায় ভাইয়ের দায়িত্ব; স্ত্রীহিসেবে স্বামীর দায়িত্ব; এবং বাবা, ভাই, স্বামী, কেউই না থাকলে সে দায়িত্ব গিয়ে পরে অন্য পরিবারের অন্য পুরুষদের ওপর। অতএব, মুসলিম নারীদের জীবিকার জন্য তাদের ঘর থেকে বের হওয়ার কোন প্রয়োজনই থাকার কথা নয়। যার কারণে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়ে মুসলিম পুরুষদের বেশি দেয়া হয়েছে নারীদের চেয়ে। সে হিসেবে দেখা যায়, অর্থ-সম্পদের দিক দিয়েও মুসলিম নারীরা তাদের পুরুষদের চেয়ে অনেক ভাল থাকার কথা, কেননা তাদের কোন খরচই নিজেদের করার প্রয়োজন হত না। কিন্তু, আজ আমাদের সমাজ সেকুলার বলে আমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছি এবং আমাদের দায়িত্বর কথা ভুলে গেছি। যার কারণে আমাদের নারীরা নিজেদের স্বাবলম্বী করার লক্ষে নারী স্বাধীনতার চেষ্টা করছে। এটা মুসলিম পুরুষদের জন্য একটি লজ্জার কথা। অনেক পুরুষ বিয়ে করার সময় হবু স্ত্রীকরণের মহরানা পর্যন্ত দেয় না; উলটো যৌতুক দাবী করে বসে! অথচ, ইসলামী নিয়ম হচ্ছে বিয়ের সময়ই মহরানা আদায় করা এবং যৌতুক বলে ইসলামে কিছু নেই। অন্যদিকে আমাদের পুরুষ সমাজ নারীদের বিষয় সম্পত্তির ভাগ ঠিক মত না দিয়ে হক টুকু আদায় করেনা । এটা সরাসরি আল্লাহর বিধানের পরিষ্কার লঙ্ঘন।

অনেকেই হজ্জ করা পর্যন্ত হিজাবের হিসেবটা বাকী রাখেন। এমন কোন শর্ত বা নিয়ম জারি নেই। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকেই হিজাব ফরজ হয়ে যায়। ইদানীং অবশ্য অনেক দেশী এবং বিদেশী মুসলিম নারীদের হিজাব পরতে দেখা যায়। হতে পারে আধুনিক নারীরা ঠেকে ঠেকে শিখছে। সব মুসলিম নারীদের এ বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত এবং হিজাব গ্রহণ করা উচিত কোন রকম বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া। আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে পুড়তে হবে দোজখের আগুনে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। শুধু নারী নয়, পুরুষদেরও হিজাব আছে! মাথায় তুপি বা পাগড়ি , গায়ে পরনে লম্বা আলখেল্লা, আর মুখ ভর্তি দাড়ি কি হিজাব ও নিকাব তুল্য নয়?

২০০৪ সালে মাকে নিয়ে হজ্জ শেষে দেশে ফিরে এলে ভেবেছিলাম দাড়িটা রেখে দেব। কিন্তু কয়েক মাস রাখার পর আমার স্ত্রীর আপত্তিতে দাড়ি শেভ করে ফেলি। তখনও আমার ধারণা ছিল, দাড়ি রাখা সুন্নত হলেও তা ঐচ্ছিক ; অর্থাৎ, না রাখলেও চলে। কেননা, নবী (সাঃ) এর যুগে দাড়ি রাখাটাই ছিল ফ্যাশন বা প্রচলন , মুসলিম অমুসলিম সকলেই তখন দাড়ি রাখত। নবী (সাঃ) কে যখন জিজ্ঞেশ করা হোল দাড়ি কিরকম রাখা উচিত, উত্তরে তিনি বলেছিলেন -

> *ইবনে উমার থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আমাদের আদেশ করেছেন আমরা যেন গোঁফ ছেঁটে ছোট করি এবং দাড়ি ছেড়ে দেই (অর্থাৎ, লম্বা হতে দেই)। (মুসলিম,* (Book #002, Hadith #0499) *এবং Book #002, Hadith #0498)*

উপরল্লেখিত হাদিসে দেখা যায় যে, নবী (সাঃ) আমাদের “আদেশ” করেছেন দাঁড়ি রাখতে এবং গোঁফ ছাঁটতে। কিন্তু আবার ০৪৯৮ নং হাদিসে আদেশের যায়গায় বলা আছে “বলেছেন”। অতএব, এই হাদিস্ দুটি আমার নজরে আসার পর আমি বুঝতে পারলাম যে মুসলমানদের দাড়ি রাখা শুধু সুন্নতই নয় বরং এটি একটি এবাদতের অংশ। পরের হাদিস টি দেখুন -

> *আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ দশটি কাজ ফিতরা তুল্য; গোঁফ ছাঁটা, দাড়ি ছেড়ে দেয়া, দাঁত খিলাইল করা, নাকের ভেতর পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়া গুলো ধোয়া, বগলের নিচের লোম অবচয় বা পরিষ্কার করা, গুপ্তাঙ্গের লোম খেউরি বা শেভ করা এবং পানি দিয়ে ধৌত করা।*

কথক তখন বল্লেনঃ আমার দশম বিষয়টি ঠিক মনে নেই, কিন্তু আমার মনে হয় তা ছিল মুখের ধুয়ে ভেতর পরিষ্কার রাখা। (মুসলিম, Book #002, Hadith #0502)

পশ্চিমা সভ্যতার রাহু গ্রাসে আসার আগে বহু শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা দাড়ি রেখে এসেছিল। ইসলামের উপর পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রাধান্য বিস্তারের ফলে মুসলিমরা দাড়ি গোঁফ ছেঁটে ফেলতে আরম্ভ করে এবং পশ্চিমাদের অনুকরণ ও অনুসরণ শুরু করে। তাই আমরা আজ বর্তমান মুসলিম দেশগুলতে মুসলমানদের বেশিভাগই দাড়িগোঁফ ছাড়া দেখতে পাই। আজ দাড়ি রাখা একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে গেছে, অথচ এটাই আমাদের করা উচিত। যে হাদিস টি আমার টনক নড়িয়ে দিয়ে আমার ঘুম হারাম করে দিয়ে আমাকে দাড়ি রাখতে বাধ্য করে, সেটি হোল -

আবু সাইদ আল-খুদ্রি থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, "পূর্বদিক থেকে এমন কিছু লোকের উদ্ভব ঘটবে যারা কোরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের গলার উর্ধে যাবে না (অর্থাৎ, কোন বাস্তবায়ন থাকবে না) এবং তারা ইসলাম থেকে এত দ্রুত বেরিয়ে যাবে যেমন একটি তীর শিকারের ভেতর দিয়ে যায়, তারা কখনই ফিরে আসবে না যদি কিনা তীর আপনাআপনি তার ধনুকের মধ্যবর্তী যায়গায় ফিরে আসে (যা কিনে অসম্ভব)।" লোকেরা জিজ্ঞেশ করল, "ওদের চিহ্ন বা চেনার অপায় কি?" তিনি (সাঃ) বললেন, "ওদের চিহ্ন হবে ওদের দাড়ি কাটার অভ্যাস।" (ফাতেহ আল-বারি, পৃষ্ঠা ৩২২, খণ্ড ১৭) (বুখারি, Book #93, Hadith #651)

এই হাদিসটি জানার পর ভাবলাম আমি অবশ্যই এই দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না। সেদিন থেকে আমি দাড়ি রেখে দিলাম। অতএব, আমি আল্লাহ্‌র কাছে আরও একবার আত্মসমর্পণ করলাম -

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বলুন, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না। (সূরা আল ইমরান - ৩:৩২-৩৩)

এ নিয়ে আর যুক্তি তর্কের অবকাশ নেই। তাল -বাহানা না করে দাড়িটা রেখে দিন। তিতুমীর বই থেকে আমি আরও জেনেছি যে আগে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা সবাই দাঁড়ি রাখতেন। নবাব সিরাজ-উদ-দউলার ইংরেজদের হাতে পরাজয়ের পর যখন হিন্দুরা ক্ষমতায় যায় তখন তাদের অত্যাচারের কারণে মুসলমানরা দাঁড়ি কেটে ফেলতে বাধ্য হয়। নতুবা মুসলমানরা দাঁড়ি রাখবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। আজ কোন হিন্দু শাসন নেই , তবুও দাঁড়ি রাখলে ব্যাপারটা যেন হয়ে যায় অস্বাভাবিক। আসুন আমরা আবার দলে দলে দাঁড়ি রাখার সংগ্রামে নেমে যাই!

রমযান মাসে পুরো মাস রোজা রাখা ফরজ; অর্থাৎ রোজা রাখতেই হয়। আমরা নামায পড়ি নিজেদের জন্য, কিন্তু রোজা রাখি আল্লাহর জন্য। ওনার সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখলে তিনি ভীষণ খুশি হন। আমরা আল্লাহকে খুশি করব নাতো কাকে করব? কোন কারণে কোন রোজা বাদ পরে গেলে সেটা পরে যেকোনো এক সময় রেখে পূরণ করতে হয়। নিজে রোজা রাখতে অক্ষম হলে তার জন্য ফিদিয়া (অর্থাৎ একজন গরীবকে তিন বেলা খাওয়ানো) দেয়ার বিধান আছে; তবুও, রোজা ছাড়া যাবেনা। হাশরের ময়দানে এই রোজা ঢাল হয়ে আমাদের দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবে। যে গাফিলতি করে রোজা রাখবেনা সেদিন তার কোন ঢাল থাকবে না নিজেকে রক্ষার জন্য।

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (সা:) বলেন, "আল্লাহ্ বলেন, "আদম সন্তানদের সব নেকী তাদের নিজেদের জন্য শুধু রোজা ছাড়া, যেটা কিনা আমার জন্য; এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব। "রোজা হচ্ছে আগুন এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য একটি ঢাল। রোজা থাকাকালীন তোমরা ঝগড়া বিবাদ থেকে এবং তোমাদের স্ত্রীজনদের সঙ্গে যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাক। কেউ তোমাদের সাথে ঝগড়া বা মারামারি করতে আসে তখন তাদের বল, "আমরা রোজা আছি" । আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার আত্মা, আল্লাহর কাছে রোজাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ অন্য যেকোনো সুগন্ধির চেয়ে প্রিয়। একজন রোজাদার ব্যক্তির দুটি আনন্দ থাকে, যখন সে রোজা খোলে বা ভাঙে, এবং যখন সে তার প্রভুর সাথে দেখা করবে কেননা তিনি তখন তার বান্দার উপর খুশি থাকবেন। "(বুখারি, Book #31, Hadith #128)*

শারীরিক সক্ষমতা এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকলে হজ্জ ফরজ হয়। জীবনে অন্তত একবার হজ্জ করার তাগিদ আছে। আমাদের নবীও জীবনে একবারই হজ্জ করেছেন। সামর্থ্য না থাকলে এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। না পারলে নাই, তবে সক্ষম হলে বেশি দেরী না করে দ্রুত কাজটা সেরে ফেলা উচিত। অনেকে বহুবার হজ্জ করেন, এতে কোন বিশেষ

সুবিধা পাওয়া যায় বলে কথাও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। হজ্জ বাদ দিয়ে ওমরাহ্ করলে হজ্জের দায়িত্ব পালন হয়না। তাই আগে হজ্জ করার চেষ্টা করা উচিত।

হজ্জে গিয়ে ঘন ঘন নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে হয়। অর্থ সহ সেটি উল্লেখ করা হল -

> *"লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ("আমি হাজির হে প্রভু, আমি হাজির,) লাব্বাইক লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, (আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাজির,) ইন আলহামদা ওয়ান্নিমাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, (অবশ্যই সব প্রশংসা, আনুগত্য, এবং রাজত্ব আপনার জন্য,) লা শারিকা লাক" (আপনার কোন শরীক নেই।")*

এই অর্থের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় আমরা সাক্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই, তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই সব প্রশংসা এবং আনুগত্যের উপযুক্ত, এবং তিনিই আমাদের প্রভু; অর্থাৎ, রাজা। কিন্তু বাস্তবে কি আমরা তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খেয়াল রাখি? অর্থ না বুঝে এবাদত করলে এ অবস্থাই হয়।

যাকাত হচ্ছে গরিবের হক। আমাদের নিসাব পরিমাণের উপর যেটুকু সম্পদ এক বৎসরের বেশি সঞ্চিত থাকে তার ওপর শতকরা আড়াই ভাগ পরিমাণ সম্পদ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করাটাই যাকাত প্রদান করা। বৎসরে একবার যাকাত দিতে হয়, না দিলে গুনাহগার চিহ্নিত হয়ে শাস্তি পেতে হবে।

> *আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (সা:) বলেন, "যাকে আল্লাহ্ ধনি করা সত্বেও সে যাকাত দেয় না, শেষ বিচারের দিনে তার সেই সব সম্পদ বিষাক্ত সর্প হয়ে যার মাথা দেখতে হবে ন্যাড়া মাথার ন্যায় এবং দুই চোখের উপর থাকবে কাল গোলাকার দাগ। সেই সাপ গুলো তার গলায় পেঁচিয়ে গালে দংশন করবে আর বলতে থাকবে, "আমিই তোমার সেই সম্পদ - প্রতিপত্তি" । তখন নবী (সা:) কোরআনের ৩:১৮০ আয়াত টি উচ্চারণ করলেন। (বুখারি, Book #24, Hadith #486)*

নিসাব কি? নিসাব হচ্ছে এক বৎসর সময় পর্যন্ত যদি ৮৭.৪৮ গ্রাম অথবা ২০ দিনার অথবা ৭১ তলা অথবা ৩ আউন্স সোনা অথবা তার সমপরিমাণ টাকা (সমকালীন বাজার দর অনুযায়ী); অথবা ৬১২.৩৬ গ্রাম বা ২০০ দিরহাম বা ৫২১ তলা বা ২১ আউন্স রুপা বা তার সমপরিমাণ টাকা জমা থাকে, তাহলে তার অতিরিক্ত পরিমাণের উপর যাকাত হয়। এই পরিমাণ সোনা রুপার সমতুল্য নগদ টাকা থাকলেও নিসাবের হিসাবে ধরতে হবে। অতঃপর, যাকাত হবে সর্বমোট হিসাবের শতকরা আড়াই ভাগ; যেটা কিনা চল্লিশ

ভাগের এক ভাগ; অথবা দশ ভাগের চার ভাগ মাত্র। ঠিকমত হিসেব করলে দেখবেন যে যাকাত আসলে বেশি হয়না। বাস্তবিকে, যাকাত দিলে টাকা কমে না, বরং বাড়ে। যাকাত দানকারীর রিজিকে আল্লাহতালা বরকত দেন। অতএব, যাকাতের ব্যাপারে উদার হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহকে খুশি করাতেই তো জয়! যাকাত সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ আছে -

> *যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায় কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদে হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে-ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদ-কারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত তাওবাহ - ৯:৬০)*

যাকাতও একটি সাদাকাহ যা কুরআনের এই নিয়ম মাফিক বৎসরে একবার বণ্টন করতে হয়। যাকাত বাধ্যতামূলক, এবং অন্যান্য সাদাকাহ ঐচ্ছিক, কিন্তু উৎসাহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি যাকাত ফান্ড নামক একটি প্রোগ্রাম থাকলেও তা বহুকাল ধরে নিষ্ক্রিয়। অতএব রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে যাকাত দেয়ার প্রচলন আপাতত নেই, আর থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় জনসাধারনের আস্থা নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর একটি যাকাত তহবিল আছে যা খুব একটা পরিচিত নয়।

অধিক সওয়াবের আশায় বেশীরভাগ মুসলিম রমযান মাসেই যাকাত দিয়ে থাকেন যদিও যাকাত বৎসরের যেকোনো সময়ই দেয়া যায়। যাকাত দেয়া সহজ করার লক্ষে আমাদের সরকারের উচিত যাকাতের পরিমাণের ওপর ১০০% ভাগ আয়কর মৌকুফ করা, যাতে করে দেশের মুসলমানেরা যাকাত দিতে কার্পণ্য বোধ না করে। এই নিয়ম চালু করলে মানুষ সহজেই যাকাত দিতে আগ্রহী হবে এবং দেশ ও জাতি যাকাতের উপকারিতা উপলব্ধি করবে।

যাকাতের মত আরও একটি সাদাকাহ আছে যা হল “ফিতরা” । যাকাত যেমন আমাদের সম্পদ পরিছন্ন করে, তেমন ফিতরা আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। প্রতিবছর আমাদের সরকার ব্যক্তিগত ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করে। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য ফিতরা দিতে হয়। ঈদ-উল-ফিতর এর দু-তিন দিন আগে অথবা ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় জামাতের আগে গরীবদের মধ্যে ফিতরা দিয়ে দেয়া উত্তম। ঠিকমত ফিতরা আদায় হলে আমাদের রোযা সব আল্লাহর দরবারে পৌছে যায়; নতুবা, তা দুনিয়া এবং আল্লাহর দরবারের মাঝামাঝি এক যায়গায় আটকে থাকে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "নবী (সা:) যাকাত-আল-ফিতরকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন যার বদৌলতে রমজানের রোজা থাকাকালীন আমাদের অলস কর্মকাণ্ড এবং লজ্জাকর কথাবার্তার কাফফারা হয়; এবং গরিবরা কিছু খেতে পায়। যারা ঈদের নামাজের আগে এর বিতরণ করবে তা হবে যাকাত, আর পরে দিলে তা সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে। "[আবু দাউদ, ইংরেজি অনুবাদ সংকলন ২, পৃষ্ঠা ৪২১, নং ১৬০৫]

আগের দিনে যেহেতু টাকা-পয়সার ব্যাবহার ছিলনা, সে সময় অন্যভাবে ফিতরা দেয়া হত -

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) মুসলিমদের আদেশ করেছেন জাকাত-উল-ফিতর হিসেবে এক সা (মুট) পরিমাণ খেজুর অথবা বার্লি দিতে। মানুষ কখনও দুই মুট পরিমাণ গমও দিত। (বুখারি, Book #25, Hadith #583)

ইসলাম চর্চার পাশাপাশি অন্যায় অবিচার চালিয়ে গেলে কোন লাভ নেই। একদিকে নামায পড়ব এবং অন্যদিকে ঘুষের লেনদেন করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করব, এভাবে আল্লাহকে খুশি করা সম্ভব নয়। কাজের বিনিময়ে চা-নাস্তার খরচ চাওয়াও ঘুষ খাওয়ার সামিল। কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে উপহার আদান প্রদান করাও নিষেধ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (সা:) যে ঘুষ দেয় এবং যে নেয় উভয়কেই অভিশাপ দিয়েছেন। (সুনান আবু দাউদ, Book #24, Hadith #3573)

আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বলেছেন, "কেউ যদি তার ভাইয়ের জন্য তোষামোদি কোরে এবং সেজন্য কাউকে কোন উপহার দেয় এবং তা অন্যজন গ্রহণ করে, তারা যেন সুদের একটি বড় দরজার দিকে এগিয়ে গেল। " (সুনান আবু দাউদ, Book #23, Hadith #3534)

মুসলমান হয়ে মরতে হলে এসব বদভ্যাস থেকে নিজেকে মুক্ত করা দরকার। কেননা, হারাম খাওয়া শরীর দোযখের আগুনের ইন্ধন। তদ্রূপ-ভাবে, সুদের লেনদেন করাও ইসলামে নিষেধ। আল্লাহতালা সুদের লেনদেনকে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল হিসেবে গণ্য করেছেন। হালাল রুজি থেকে হজ্জ-যাকাত না হলে কবুলও হয়না।

যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে: ক্রয়-বিক্রয় ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লা' হ তা' আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তা' আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। ... হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাক। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:২৭৫, ২৭৬ এবং ২৭৮)

হে ইমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। (সূরা আল ইমরান - ৩:১৩০)

আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায় ভাবে। বস্তুত; আমি কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব। (সূরা আন নিসা - ৪:১৬১)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (সা:) তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা সুদ নেয়, সুদ দেয়, সুদের লেনদেন এর সাক্ষী হয়, এবং যে এসবের হিসাব রাখে। (সুনান আবু দাউদ, Book #22, Hadith #3327)।

আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোর (বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকগুলোর) উচিত দেশের মুসলিমদের জন্য সুদ বিহীন একাউন্ট এর ব্যবস্থা রাখা যে একাউন্ট এ কোন সুদ দেয়া হবে না এবং কোন ফী ও চার্জ করা হবে না। একাউন্ট টি হবে একদম ফ্রি। একাউন্ট টি ফ্রী এবং সুদ বিহীন হলে কোন আয়করও অরপিত হবেনা। এরকম একাউন্ট এর অস্তিত্ব আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেচদেখেছি এবং আমার নিজেরও ছিল একটি। ওরা পারলে আমাদের কি অসুবিধা?

আংশিকভাবে ইসলামে থেকে খুব একটা সুবিধা হবেনা। অনেকের ধারনা যে সারা জীবন ঘুষ এবং অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মস্বাদ বা চুরি করে পড়ে হজ্জ করলে সাত খুন

মাফ হয়ে যাবে; এমন কোন দলিল নেই। তাই যদি হত, তাহলে সবাই সারা জীবন চুরি চোট্টামি করে শেষে হজ্জ করে সব মাফ করিয়ে নিত। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। হারাম পথে উপার্জন করা টাকা দিয়ে হজ্জে গেলে সে হজ্জ কবুলই হবে না। হজ্জ কবুল হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন আবশ্যক।

যারা সরকারি গদিতে বসে লুটপাট করে তারা দেশের সম্পদ লুট করে। অতএব, তারা দেশদ্রপহি- অর্থাৎ দেশ ও জনগণের শত্রু। চুরির দায়ে হাত কর্তন করার ইসলামিক বিধান যদি এদেশে চালু হত তাহলে দেশে চুরি-চোট্টামি কমে যেত। শাস্তির ভয় না থাকাতে এ দেশে অন্যায়-অবিচার বেড়েই চলেছে। সৌদি আরবের মত শিররচ্ছেদ ব্যবস্থা থাকলে নর-হত্যাও কমে যেত। কিছুদিন আগে সৌদি আরবে যে কজন বাংলাদেশীর শিরশ্ছেদ হয়ে গেল এক হত্যার বিচারে, আপনাদের কি মনে হয় সেখানে বাংলাদেশীরা আর সাহস পাবে আরও হত্যা করার? দেশেও এই শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে এধরনের হত্যা বন্ধ হবে, নয়ত চলতেই থাকবে। আমাদের উচিত ধীরে ধীরে দেশে শরিয়া মোতাবেক আইন ও বিধান চালু করা নতুবা এ অরাজক থেকে মুক্তির আর কোন উপায় নেই। সেকুলারিজম আমাদের ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে ।

> *হে ইমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:২০৮)*

আল্লাহতালা আমাদের আদেশ করেছেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামে আসতে। নতুবা ইসলামের পরিপূর্ণ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আল্লাহতালা কুরআন হাদিসে বার বার আমাদের সতর্ক ও মনে করিয়ে দিচ্ছেন দোযখের আগুনের শাস্তির কথা; উনি কিন্তু আমাদের সাথে মশকরা করছেন না। যে উনার উপাসনা ঠিকমত করে তিনি তার প্রতি উদার। আর যে কিনা উনার সাথে রসিকতা করে তিনি তার প্রতি কঠোর। মুসলমান হয়ে ইসলাম ধর্মকে হালকা ভাবে নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

> *আর তোমরা এমন ফ্যাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষত: শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর। (সূরা আল- আনফাল - ৮:২৫)*

> *হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানেরব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ কোরো না।*

সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। (সূরা আল মায়েদাহ - ৫:৮)

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। এতে ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কার্যায় পর্যন্ত জীবন বিধান দেয়া আছে। আমাদের বিচার বিভাগ কোরআন নির্ভর হওয়া দরকার -

নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না। (সূরা আন নিসা - ৪:১০৫)

অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:১৬৬)

ইসলাম নিয়ে রাজনীতি করার কোন সুযোগ নেই ; এবং কোন রাজনীতির সাথে জড়িত থাকারও অনুমতিও মুসলমানদের দেয়া হয়নি । ইসলামের রাজনীতি আল্লাহর রাজনীতি, কোন মানুষের রাজনীতি বা তাঁবেদারি নয় । আমাদের দেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো এখনও ভুল এবং ঘোরের মধ্যে আছে।

হে মুমিনগণ! হালাল মনে কোরো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানির জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা এহরাম থেকে বের হয়ে আস, তখন শিকার কর। যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়েরশত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কোরো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা' আলা কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা আল মায়েদাহ - ৫:২)

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা সেকুলার রাষ্ট্রতন্ত্রথকে সম্পূর্ণ আলাদা। একটি ইসলামী রাষ্ট্রে থ আল্লাহতালা হলেন সর্বেসর্বা এবং রাজা বা বাদশাহ -

হে ইমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ কোরো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী। (সূরা আত তাওবাহ - ৯:২৩)

সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন: হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (সূরা ত্বোয়া-হা - ২০:১১৪)

অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (সূরা আল মু' মিনূন - ২৩:১১৬)

মানুষের অধিপতির,...(সূরা নাস - ১১৪:২)

দুনিয়াতে যে যত রাজা-বাদশাহ বা রানি-সম্রাজ্ঞীই হোক না কেন; আল্লাহর উপরে কেও নেই। উনি যে আইন কানুন (যাকে শারীয়াহ বলা হয়) আমাদের দিয়েছেন কুরআন এবং হাদিসে তাই আমাদের অনুসরণীও যেমনটি ছিল নবী করিম (সা:) এর সময়। ইসলামী রাষ্ট্রে।কোন রাষ্ট্র প্রধান বা প্রধান মন্ত্রীমন্ডলতে কিছু নেই, আছে আল্লাহর খলিফা যিনি কিনা শুধু খেয়াল রাখেন সবাই আল্লাহর বিধান মেনে চলছে কিনা, না মানলে শাস্তি; তাও ইসলামের বিধান মোতাবেক। কোন অপরাধের জন্য কি শাস্তি হবে তা সব ইসলামে দেয়া আছে। নতুন করে কোন কিছু আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রসুল (সা:) বলেন, "ইসলামের শুরু হয় একটি আশ্চর্য এবং নতুন বিষয় হিসেবে, এবং এর পুনরাবৃত্তিও হবে একটি নতুন ও আশ্চর্য বিষয় বস্তু হিসেবে; অতএব, যারা ইসলামের পনরজাগরনের কাজ করবে তাদের প্রতি অভিনন্দন। (মুসলিম, Book #001, Hadith #0270)

আমরা ইসলাম থেকে এত দূরে সরে গেছি যে আজ আমাদের কাছে ইসলাম ধর্মটিকে নতুন বলে মনে হয়। এবং এর জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। আমরা ইসলামকে অবহেলা করেছি বহু যুগ ধরে যার কারণে আজ আমরা ইসলামের আসল রূপ ভুলে গেছি। ভুল ভ্রান্তিতে ভরা মনগড়া ইসলামের ওপর জোর জবরদস্তি দারিয়ে আছি আমরা যার আসলে কোন অস্তিত্বই নেই। আমাদের এই দুরবস্থা থেকে রেহাই পেতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ইসলামের আসল যায়গাতে, এবং তা হল - কুরআন এবং সুন্নাহ।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিরহুম ডঃ পণ্ডিত শঙ্কর দায়াল শর্মা (১৯৯২-৯৭) কুরআন সম্পর্কিত একটি কবিতায় লিখে গেছেন যা হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন আমাদের বড় ভাই মুহাম্মদ আলমগির সুদূর সিডনি থেকে যার অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য-

আল-কোরআন
যা ছিল কর্ম সঞ্চালনের গ্রন্থ হয়ে গেল প্রার্থনা-পুস্তক;
যা ছিল অধ্যয়নের জন্য রয়ে গেল আবৃত্তির জন্য;
জীবন্তদের বিধান ছিল হয়ে গেল মৃতদের ছাড়পত্র;
জ্ঞানবিজ্ঞানের শাস্ত্র ছিল পরে গেল মূর্খদের হাতে;
সৃষ্টিকে বশ করার আহ্বান ছিল থেমে রইল মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে;
প্রাণহীনকে চেয়েছিল প্রাণবন্ত করতে লেগে গেল বিদেহীদের পরিত্রাণ-কল্পে;
ওহে মুসলমান, এ তুমি কি করলে? চোখ মেল, আর ভেবে দেখ!

খেয়াল করে পড়ে দেখুন, তিনি ভুল কিছু লেখেননি। তিনি হিন্দু হয়েও ব্যাপারটি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন, অথচ আমরা মুসলমান হয়ে তা অনুধাবন করতে পারিনি। আমরা সব শুধু গরু খাওয়া মুসলিম মাত্র, ইসলামের কিছুই জানিনা। আমাদের জীবন-যাপন পার্ব্ বর্তী দেশ ভারতের হিন্দুদের মতই। পার্থক্য শুধু, আমরা গরু খাই, আর ওরা খায়না। সময় থাকতে ব্যাপারটা মেনে নিয়ে নতুন করে ইসলাম শিক্ষায় লেগে যান, উপকৃত হবেন। অনেক সময় ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। আর কবে আমাদের উপলব্ধি হবে?

সেকুলারিযম সেকুলারিযম করে জীবনটা কাঁটিয়ে আমরা আমাদের মেরুদণ্ড হারিয়ে পুরুষ শাসিত সমাজটাকে নারী শাসিত সমাজে পরিণত করে আজ মহিলাদের কথায় উঠা বসা করছি। অথচ আমাদের নবী (সা:) পরিষ্কার বলে গেছেন নারী শাসিত সমাজের কোন উন্নতি হয় না।

> *আবু বাক্রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল-জামাল যুদ্ধের সময়, যখন নবী (সা:) জানতে পারলেন যে পারস্য দেশে খসরু'র মেয়েকে রানি করা হয়েছে, আল্লাহর অনুগ্রহে আমি নবী (সা:) কে বলতে শুনেছি, "সে জাতির কোন উন্নতি হবে না যে জাতি একজন নারীকে নেতা হিসেবে মনোনীত করে।" (বুখারি, Book #88, Hadith #219)*

আরবে ইসলামের আগমনের পর্বে সে দেশের যে অবস্থা ছিল (জাহিলিয়ার যুগ), আজ আমাদের দেশে সেই একই অবস্থা। দেশের মানুষ আজ ইসলাম ভুলে চুরি-ডাকাতি, খুন-

রাহাজানি, মিথ্যাবাদ, জোচ্চুরি, ব্যভিচার, বেঈমানি তে জড়িত। খাওয়ায় ভেজাল দেয়া, ওজনে কম দেয়া, অতিরিক্ত মুনাফা রাখা, সুদের লেনদেন সব ইসলাম পরিপন্থী কার্যকলাপ আমাদের সমাজে পরিব্যাপ্ত। যে বিষয়ে আমরা বেশীরভাগই উপেক্ষা করে থাকি সেটি হল সহায় সম্পত্তি ভাগাভাগির সময়। অথচ আল্লাহতালা নিজেই এ বিষয়ে কুরআনে সুরা নিসা সহ আরও বিভিন্ন যায়গায় পরিষ্কার বলে দিয়াছেন কিভাবে তা করতে হবে। আল্লাহর দেয়া বিধান অমান্য করা এক ভয়াবহ অপরাধ, এবং তা অমান্য করে আমরা একে অপরের ওপর দিনের পর দিন ভীষণ অন্যায় করে যাচ্ছি।

আমাদের নবীর (সা:) আশঙ্কাই সঠিক হোল, আমরা পরকালের চেয়ে দুনিয়া নিয়েই বেশি ব্যস্ত আজ। গাড়ি-বাড়ি, সম্মান-প্রতিপত্তি নিয়ে আমরা সবাই খুব ব্যস্ত । আমাদের অনেকেরই নিম্নোক্ত হাদিসটি জানা নেই -

> *আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র নবী (সা:) বলেন, "যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনটি বিষয় তাকে অনুসরণ করে, তার দুটি সমাধির পর ফিরে আসে এবং একটি ঐ মৃত ব্যক্তির সাথে থেকে যায় - সেসব হোল: তার আত্মীয়স্বজন, তার সহায়সম্পত্তি, এবং তার কর্মফল; আত্মীয়স্বজন এবং সহায়সম্পত্তি ফিরে যায় কিন্তু কর্মফল থাকে।" (বুখারি, Book #76, Hadith #521)*

এই উপলব্ধিতে আমি নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করি -

শূন্য থেকে শুরু

শূন্য থেকে শুরু এ জীবন;
পূর্ণতা এলো ধীরে;
হঠাৎ করেই এলাম চলে,
অস্তিত্বের সন্ধানে।

মা বাবার স্নেহ মমতায় পূর্ণ মানুষ হয়ে ,
ব্যস্ততাও বেড়ে গেল যেন ক্রমে ক্রমে।
দুনিয়ার মোহে শুধু করেছি সংগ্রাম ;
ভুলে ছিলাম প্রভুর প্রতি কর্তব্য আমার।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পেছনে তাকিয়ে দেখি;
নেকীর থলী আমার পুরো টাই যেন খালি।
খেটেছি অনেক আমি করেছি বাহাদুরি;
ও পাড়েতে যাবেনা নেয়া বস্তুর কানাকড়ি।

মাটির সৃষ্ট আমি মাটিতে যাব মিশে ;
সাড়ে তিন হাত গভীর মাটির কবরের নিচে।
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পরিশ্রান্ত আমি;
শূন্যতার অনুভবে ভীত-হতাশায় আছি।

অপেক্ষায় আছে সামনে প্রভুর সমাবেশ,
নেই সাথে কোন কিছু করিব যে পেশ।
জীবনের রহস্য আজ বুঝতে পারছি বেশ ;
শূন্যতে শুরু যার শূন্যতেই শেষ।

অতএব, আমাদের চেষ্টা করা দরকার দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগে সাথে কিছু ভাল কর্মফল নিয়ে যাওয়া। গাফিলতি করলে সময় ফুরিয়ে গেলে আর সুযোগ নাও আসতে পারে। সময় থাকতে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে ওনার সাথে দেখা করার প্রস্তুতি দরকার।

অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া মুসলমানদের উচিত নয়; কেননা, আল্লাহতালা আমাদের জানাচ্ছেন -

> *যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত। (সূরা আল ইমরান - ৩:৮৫)*

> *... আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম , তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে ; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা' আলা ক্ষমাশীল। (সূরা আল মায়েদাহ - ৫:৩)*

এতে বোঝা যায় যে আল্লাহ্‌র কাছে ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা নেই; অতএব, ইসলাম ছাড়া আর অন্য কোন ধর্মের অনুষ্ঠানে (যেমন খৃষ্ট-মাস, ভ্যালেন্টাইন ডে, দিওয়ালী, দুর্গা পূজা, হ্যাঁলোইন ডে, ইত্যাদি) যাওয়া বা তা উৎযাপন করা নিষেধ। তারপরও যদি আমরা এই আদেশ অমান্য করি, তাহলে আমাদের পরিণতি হবে এরকম -

> *যে কোন দলকে অনুসরণ করে, সে তখন সে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (আবু দাউদ, Book # 27, Hadith 3512, 4020, and 4031) [যদিও এ হাদিস টিকে সহিহ বলে ধরে নেয়া হয়, কিন্তু আমার অনুসন্ধানে আমি যা বুঝতে পেরেছি যে এটি সম্ভবত নবীর (সা:) নয়, অন্য কারো উক্তি; সম্ভবত হযরত ওমর (রা:) এর। এর গুরুত্ব অনুভব করেই আমি এটা এখানে টেনে এনেছি।]*

নিজেদের আকর্ষণীও করতে এবং অন্যকে আকর্ষণ করতে আমাদের অনেক নারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মুখে এবং শরীরে ছবি বা ট্যাটু লাগাত শুরু করেছে যা ইসলামে নিষিদ্ধ -

> *আবু জুহাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণীত: নবী (সা:) নিষেধ করেছেন রক্তের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করতে, কুকুরের বিনিময়ে অর্থ নিতে, বেশ্যাবৃত্তির অর্থ নিতে, সুদ (রিবা) নিতে বা দিতে কেননা উভয়েই অভিশপ্ত, নারীদের ট্যাটু দেয়া ও নেয়া, এবং চিত্রকারের চিত্রাঙ্কন করা। (বুখারি, Book #72, Hadith #845)*

আমাদের সেকুলার সমাজে এসব প্রতিদিন প্রতিনিয়ত চলছে এবং বেড়েই চলেছে। এসব কোন কিছুর মধ্যে ভাল কিছু নিহিত নেই বলেইতো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত। এখন ভেবে দেখুন, ইসলাম ছাড়া এ পরিস্থিতি থেকে কি রেহাই পাওয়া সম্ভব? সেকুলারিজম কি আমাদের কোন উপকার দিয়েছে? এখনও কি আমরা শয়তানের ধোঁকার পেছনে ছুটবো? নাকি মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে ইসলামে ফিরে আসব? সমস্যাটা কি বোঝাতে পারলাম?

আপনারা হয়ত লক্ষ্যকরেছেন যে আমি এ লেখায় কোরআন এবং সহিহ সুন্নাহ ছাড়া আর কোন সূত্র বা উল্লেখ আনিনি; আমি চেষ্টা করেছি বুখারি, মুসলিম, সুনান আবু দাউদ এবং মালিক মুয়াত্তা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে। আমি সাধারণত তিরমিযি এবং সুনান ইবনে মাজাহ এর হাদিসে যাই না, কেননা ঐ সকল হাদিসে অনেক জাল ও দুর্বল হাদিস রয়েছে। যেমন ধরুন, শবে-বরাত এর ব্যাপার; একমাত্র ইবনে মাজাহ'র হাদিস ছাড়া আর কোথাও শবে-বরাতের উল্লেখ পাওয়া যায়না। সম্ভবত ঐ হাদিস শিয়া হাদিস থেকে আসা। তদ্রূপ, ইবনে বাই-হাঁকি এর হাদিস সমূহ শুধুমাত্র শিয়া সূত্রেই পাওয়া যায়। আমাদের

কোন অবস্থাতেই শিয়া সুত্র থেকে কোন কিছু নেয়া থেকে সাবধান হতে হবে কেননা তাদের মধ্যে অনেক বিদাত প্রচলিত আছে যে মূল ইসলামে নেই । শুধু শীয়া নয়, এদেশে আরও কিছু খারিজি দল সক্রিয় ; যেমন, ইসমাইলি এবং আহমাদিয়া। যদিও এসব দল ছোট, কিন্তু এরা সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাদের আর্থিক ক্ষমতার বলে; কেননা, এদের বেশীর ভাগি ব্যবসায়ী এবং এদের বৈদেশিক সহযোগিতা আসে প্রচুর। এসব দলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হোল, এরা নিজেরা কোন বই-পত্র (অর্থাৎ, কোরআন এবং হাদিস) পড়ে না। যার কারণে, ওদের ইমাম বা নেতা যা বলে তাই তারা বিশ্বাস করে এবং মানে। ভুল বা শুদ্ধতা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করে না। এ কারণে, এরা আল্লাহ্‌র চেয়ে তাদের নিজেদের দলের শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে - যা কিনা শিরক। এদের অনেকেই যখন নিজেরা ধর্মীয় লেখাপড়া শুরু করে, তখন তারা সত্য খুঁজে পায় এবং আসল ইসলামে চলে আসে।

আমাদেরও ঠিক একই দশা হবে যদি কিনা আমরা তাদের মত ইমাম নির্ভর হয়ে যাই। অতএব, আমাদের সহিহ বই-পুস্তক জোগাড় করে পড়া দরকার। নিজেরা পড়া শুরু করলেই আমরা বুঝতে পারব কোন ইমাম সত্য বলে আরে কে বলে মিথ্যা।

১৮ শতাব্দী পর্যন্ত ইবনে মাজাহ'র হাদিস সমূহ নিয়ে দ্বিমত ছিল এবং সন্দেহের চোখে দেখা হত। এমনকি ৩০ বছর আগেও আমাদের দেশেও ইবনে মাজাহ বা বাইহাকির কোন নামগন্ধ ছিলনা। হঠাৎ করেই যেন ইবনে মাজাহ এবং বাইহাকির হাদিস সমূহ প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলো। আমার ধারণা, ইসলামি ফাউন্ডেশন ইবনে মাজাহ'র অনুবাদ করার পর থেকেই এ দেশের মুসলিম সমাজ এসব হাদিস ব্যাবহার করতে শুরু করে। জাল হাদিসে বিদাত ভর্তি, অতএব, এই তাদের পছন্দ। তার সর্বমোট ৪,৩৪১ টি হাদিসের মধ্যে ১,৩৩৯ টিই নতুন (অর্থাৎ সেগুলো আর কোথাও পাওয়া যায়না), এবং শুধুমাত্র ৪২৮ টি হাদিস গ্রহণযোগ্য। আরও বিপদজনক ব্যাপার হোল, আবু দাউদ এবং আল-তিরমিযি দুর্বল হাদিসকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ইবনে মাজাহ তা করেননি, যার কারণে সহিহ, দুর্বল এবং মিথ্যা হাদিসের মধ্যে পার্থক্য করা মুশকিল ।

> *আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: যে বিষয়টি আমাকে বেশি বেশি হাদিস তোমাদের কাছে বর্ণনা থেকে বিরত রাখে সেটি হোল, নবী (সা:) বলেছেন, "যে আমার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলল, অবশ্যই সে দোজখের আগুনে তার স্থান করে নিল।*
> *"(বুখারি, Book #3, Hadith #108)*

বহুকাল আমি "Ink of a scholar is holier than the blood of a myrtr" অর্থাৎ, "পণ্ডিতের কলমের কালী শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র" এই বাক্যটিকে সহিহ হাদিস বলে মনে করতাম। পরবর্তীকালে যখন এটি সহিহ কিনা যাচাই করার চেষ্টা করি তখন বুঝলাম হাদিসটি মিথ্যা। কোন সহিহ হাদিসে এর অস্তিত্ব নেই; এমনকি ইবনে মাজাহ তেও নেই! অথচ অনেক ইসলামী বইয়ে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার, আমাদের দেশে বহু প্রচলিত "নামায বেহেস্তের চাবি" হাদিসটিও জাল; কোন সহিহ হাদিসে এর উল্লেখ পাওয়া যায়না। এর একটি উল্লেখ অবশেষে পাওয়া গেল ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর বাংলা অনুবাদ মুসনাদে আহমদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৫৫ তে তাও আবার উল্লেখ সহ যে, "আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদিসটি আমি পাই নি। তবে তার সনদ উত্তম।" -

> *তার [অর্থাৎ, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ)] থেকে আরও বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতের চাবি হোল নামায। আর নামাযের চাবি হোল পবিত্রতা।*

সনদ উত্তম হোলেই হাদিস সহিহ হয়না, অথচ সহিহ হাদিস বলে পরিচিত এই বাক্যটি বাঙ্গালীদের মুখে মুখে। তবে, এই হাদিস থেকে নামায এবং ওজুর গুরুত্ব বঝানো হয়েছে যা কিনা আমরা অন্য বহু হাদিস থেকেও পাই। যেহেতু নামাযের হিসেব আগে হবে , তাই এটাকে চাবি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; তাই বলে এটাকে রাসুল্লুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিস বলে প্রচার করা ঠিক নয়, যেহেতু আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। সন্ধেহজনক বিষয়াদি থেকে দূরে থাকাই উত্তম।

মুহাম্মাদপুরের টাউন হল মার্কেটের সামনে পশ্চিম কোনায় এই স্তম্ভটি আবস্থিত। লক্ষ্য করে দেখুন শুধু লেখা আছে "আল-হাদিস", কিন্তু উল্লেখ নেই কোন হাদিসের কোথায়। তেমনি তার ঠিক অপর পাশেই কোরআনের একটি আয়াত লেখা আছে, অথচ কোরআনের কোন যায়গা থেকে আয়াতটি নেয়া তার উল্লেখ নেই।

ঠিক সেরকম আরও একটি হাদিস "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত" ইবনে মাজাহর ২৭৭১ নং হাদিস ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায়না। এই হাদিসটি যদি সত্যি হয় তহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে সব মায়ের পায়ের নীচেই যদি বেহেস্তের অবস্থান তাহলে কোন মা-ই দোজখে যাবে না! বলুন দেখি, এটা কি হতে পারে? এরকম আরও অনেক জাল হাদিসের প্রচলন রয়েছে আমাদের মুসলিম সমাজে যা থেকে মুক্ত থাকতে হলে আমাদের সাবধানে যাচাই বাছাই করতে হবে কোরআন এবং অন্যান্য সহিহ হাদিসের আলোকে।

জিহাদ ইসলামের একটি মূল ধারা। জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয় - মিষ্টি কথায় হয়নি। ইসলাম আজ একটি প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ধর্ম যার অনুসারীর সংখ্যা অন্য

সব ধর্মের চেয়ে বেশি; কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা নেহাত খুবই কম। এবং এই অনুশোচনা থেকেই এই লেখার সূত্রপাত।

> *থাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) বলেছেন, "খুব শীঘ্রই অন্যান্য দল একে অন্যকে আমন্ত্রণ জানাবে তোমাদের আক্রমণ করার জন্য যখন তাদেরকে তোমাদের সাথে ভাগ বাটোয়ারার ব্যাপার আসবে।" একজন জিজ্ঞেস করল, "সেটা কি হবে আমাদের সে সময়কার সংখ্যালঘুটার কারণে?" তিনি উত্তর দিলেন, "না, তোমরা সে সময় সংখ্যায় অনেক থাকবে; কিন্তু তোমাদের অবস্থা গাদ এবং আবর্জনার মত হবে যেন এক জলস্রোতের ন্যায়, এবং আল্লাহ্ শত্রুর মধ্যে তোমাদের ভয় তুলে নিয়ে ওয়াহণ সহ তা তোমাদের হৃদয়য়ে স্থাপন করবেন।" একজন জিজ্ঞেস করল, "ওয়াহণ কি?" নবী (সা:) জবাবে বললেন, "দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" (আবু দাউদ, Book #37, Hadith #4284)*

হাদিসটি আজ আশ্চর্যজনক ভাবে সত্য। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অবস্থা এমনই যে তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা সত্বেয়াওআজ তারা ভিত, পরাজিত এবং জিহাদে বিমুখ। তাই আমরা কোরআনে দেখতে পাই আল্লাহতালা আমাদের জিজ্ঞেস করছেন -

> *আর তোমাদের কি হল যে , তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে , যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর ; এখানকার অধিবাসীরা যে , অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও । (সূরা আন নিসা - ৪:৭৫)*

> *হে ঈমানদারগণ , তোমাদের কি হল , যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয় , তখন মাটি জড়িয়ে ধর , তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে ? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। (সূরা আত তাওবাহ - ৯:৩৮)*

জিহাদের একটি অর্থ হোল অন্যায়ের প্রতিবাদ করা; যা আজ আমরা মটেও করিনা। যার কারণে অন্যায়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের বর্তমান বিশ্বের অবস্থার

পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুসলমানদের আরেক দফা জিহাদ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে; এবং তা ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য -

> *তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তা-রূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই , তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র । তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন , যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে । তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে , যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন , যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে । হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে । আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে , তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (সূরা আত তাওবাহ - ৯:৩১-৩৪)*

আমাদের মধ্যে কাপট্য ঢুকে গেছে; আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি নিজেদের ইচ্ছেমত ইসলামকে সাজিয়ে নিয়ে। আমরা আমদের পছন্দ মতন ইসলাম অনুসরণ করি, যা পছন্দ নয় তা করিনা। অনেকে আবার নিজে কিছু পালন না করলেও অন্যকে ঠিকই আদেশ উপদেশ করি। আমাদেরকে অবশ্যই এসব স্বভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অন্যের দোষ ত্রুটি দেখার আগে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে হবে। পরিশেষে কোরআনের কয়েকটি আয়াত দিয়ে লেখাটি শেষ করছি, মনোযোগ দিয়ে সেগুলো পরে দেখুন -

> *তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট , সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে , তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না । আর যারা জ্ঞানে সুগভীর , তারা বলেন: আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (সূরা আল ইমরান - ৩:৭)*

আপনি কি তাকে দেখেন না , যে তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্য-রূপে গ্রহণ করে ? তবুও কি আপনি তার জিম্মাদার হবেন? (সূরা আল-ফুরকান - ২৫:৪৩)

আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে , আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট তায় পতিত হয়। (সূরা আল আহযাব - ৩৩:৩৬)

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও , অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর ? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না ? (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:৪৪)

...তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর ? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে । আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (সূরা আল বাক্বারাহ - ২:৮৫)

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে , আর তারাই হোল সফলকাম। (সূরা আল ইমরান - ৩:১০৪)

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত , মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে । আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো , তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হোল পাপাচারী। (সূরা আল ইমরান - ৩:১১০)

এ লেখায় আমি শুধু সম্পর্কিত কোরআন এবং হাদিসের উল্লেখ এনেছি মাত্র। আরও অনেক মূল্যবান তথ্য ও জ্ঞান রয়ে গেছে হাদিস শাস্ত্রে। সময় নিয়ে সব মুসলমানের পড়া দরকার। নবী (সা:) যুগে এসব হাদিসের সংকলন ছিলনা। হাদিসের সংকলন হয়েছে অনেক পরে। কিভাবে হাদিসের সংকলন হয় তা বোঝার জন্য আমি "হাদিস সংকলনের ইতিহাস" বইটি ফর্দে যোগ করেছি। কিন্তু আজ আমাদের সাথে আমাদের প্রিয় নবী (সা:)

আর নেই, নেই ওনার সাহাবীরা, কিন্তু আছে ওনার লিপিবদ্ধ করা হাদিস সমূহ এবং তার জীবনী। নবীর (সা:) এর সহচরী এবং সহযোগীরা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হাদিসের প্রয়োজন হয়নি কেননা তারা সরাসরি নবীর কাছে কোন কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন করতে পারতেন। পরবর্তীকালে তারা নিজেরা নিজেদের মধ্য আলোচনা করে পরিস্থিতির সামাল দিতেন। নিম্নের হাদিস থেকে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি -

> *আলি (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আমরা নবীর (সা:) কোন কিছুই লিখে রাখিনি একমাত্র কোরআন এবং এই কাগজে যা লেখা আছে তো ছাড়া, যেখানে নবীর এই বানীগুলোই আছে, "মদিনা হচ্ছে একটি ধর্মস্থান অমুক পাহাড় থেকে অমুক পর্যন্ত ইত্যাদি; অতএব, যারা কোন নতুন কিছু আবিষ্কার বা বৈধর্য্যে:যোগ করে অথবা অন্যায় করে, অথবা তাদের কাউকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের গজব তাদের উপর পরবে; তার কোন ফরজ এবং নফল এবাদত কবুল হবেনা। কোন মুসলিম কাউকে আশ্রয় দিলে, সে যদি তাদের মধ্যে সামাজিক অবস্থায় অধমও হয়, সকল মুসলিমের উচিত সেই আশ্রয়কে নিশ্চিত করা। যে এ ব্যাপারে মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের গজব তাদের উপর পরবে; তার কোন ফরজ এবং নফল এবাদত কবুল হবেনা। এবং যদি কোন মুক্ত ক্রীতদাস তার আগের মনিবের দলভুক্ত লোকজন ব্যতীত তার পূর্ব মনিব যে তাকে মুক্ত করেছে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে মনিব হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের গজব তাদের উপর পরবে; তার কোন ফরজ এবং নফল এবাদত কবুল হবেনা।" সাইদ থেকে বর্ণিত: আবু হুরায়রা একদা লকজনকে ডেকে বললেন, "তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমরা আর কোন দিনার ও দিরহাম পাবেনা? (অর্থাৎ অমুসলিমদের কাছ থেকে আয়কর বা যিজয়া)" এতে একজন জিজ্ঞেস করল, "ও আবু হুরায়রা! এমন অবস্থার যে উদয় হবে তা আপনাকে কে বলল?" তখন তিনি বললেন, "সেই রবের শপথ যার হাতে আবু হুরায়রার জীবন, আমি এটা জেনেছি আমাদের সত্য এবং সত্যে অনুপ্রাণিত নবীর নিকট থেকে।" লোকজন জিজ্ঞেস করল, "তিনি কি মন্তব্য করেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসুলের আশ্রিত ধিম্মিরা (অর্থাৎ, অমুসলিমরা) হিংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে, অতএব আল্লাহ্ ধিম্মিদের হৃদয় এমন সাহসী করে দেবেন যে তারা যিজয়া (যে ট্যাক্স দেয়ার কথা) দিতে অস্বীকার করবে।" (বুখারি, Book #53, Hadith #404 এবং Book #83, Hadith #50)*

এই লেখা দিয়ে আমি আপনাদেরকে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। শুধু মাত্র একটি লেখায় সব জ্ঞান টেনে আনা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। প্রবন্ধ লেখার নিয়তে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত এটা একটা বইয়ে পরিণত হয়েছে। আপনাদের ইসলাম সম্পর্কে আরও জানার সুবিধার জন্য প্রবন্ধটি পরিসমাপ্তির আগে কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করা হোল যা আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন আপনাদের যার যার বাড়িতে নিজ নিজ পাঠাগার তৈরি করার জন্য। এ পাঠাগার শুধু আপনার নিজের জন্য নয়, পরিবারের সবার ইসলাম শিক্ষায় সহায়তা করবে, ইনশাল্লাহ।

বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, আগের মত আমাদের ঘাড়ে এখন আর কোন বিদেশী শক্তি নেই যেমনটি ছিল ব্রিটিশ আমলে। যদিও জনাব আবু রুশদ তার "গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানের কথা - বাংলাদেশে "র" - আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান" বইটিতে "র" (Research and Analysis Wing – RAW) এর অর্থাৎ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার আমাদের দেশের ওপর নজরদারির কথা প্রমাণসহ লিখে গেছেন যা কিনা উল্লেখযোগ্য; কিন্তু শুধু "র"-ই নয়, আরও অনেক দেশের গোয়েন্দা বাহিনী এদেশে কাজ করছে। তবে যে যাই করুক, আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রেখে এবং ওনার ওপর আস্থা রাখলে কেও কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন কাজ হয়না। অতএব , আল্লাহ্‌র নিরাপত্তাই হোল সবচেয়ে বড় এবং উত্তম নিরাপত্তা।

> *অথচ আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে যথার্থই জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং **সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট।** (সূরা আন নিসা - ৪:৪৫)*

ব্রিটিশদের হাতে মুঘল সম্রাজ্জের পতনের সাথে ভারত উপমহাদেশে ইসলামের শাসনের পতন ঘটে। অবশেষে একপর্যায়ে ভারতের মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। খিলাফা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান কর্মসূচী শুরু হলেও , অবশেষে পাকিস্তান দুটি অংশে সৃষ্টি হয় - পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। এই পাকিস্তান সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য মুসলমানদের জন্য পৃথক ইসলামী রাষ্ট্র (Islamic Republic) কায়েমের কথা থাকলেও অবশেষে তা না হয়ে দেশটি মুসলিম আদ্ধুশিত সেকুলার রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা পায়। অতঃপর ১৯৭১ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়; সেও আরেক সেকুলার রাষ্ট্র। অতএব , মুঘলদের পর আমরা আর ইসলামী শাসনের মধ্যে ফেরত আসতে পারিনি। আজও পাকিস্তান নিজেদের ইসলামী রাষ্ট্র (Islamic Republic of Pakistan) নাম দিলেও, মুলত চলে সেকুলার পদ্ধতিতে।

উমার ইবন আল-খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, "কেউ যখন কাউকে চাকুরী (বা দায়িত্ব) দেয় পক্ষপাত বা রক্ত বন্ধনের কারণে এবং অন্য কোন কারণ ছাড়া, সে আল্লাহ্ ও তার রাসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। এবং যে জেনে শুনে একজন খারাপ লোককে চাকুরী (বা দায়িত্ব) দেয়, সে তারিই মত।" [আল-ইদারাহ আল-আশকারিয়াহ ফী আদ-দাওলাত আল-ইস্লামিয়াহ, ১/৬৬]।

আল্লাহ্‌র বিধান (অর্থাৎ ইসলাম) ও আদেশ বাদ দিয়ে মানুষের মনগড়া সেকুলারিসমে বাস করে আমরা কখনও নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করতে পারিনা। আল্লাহ্‌র রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন ইসলামী শাসন কায়েম করার জন্য যাতে করে মুসলমানরা ইসলামী আইন বা শরিয়া আইনে বসবাস করতে পারে। কিন্তু , তা আজও আর হয়ে ওঠেনি। সুতরাং আসুন , আল্লাহকে ভালবেসে এবং ওনার শাস্তির ভয় করে আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ি যার স্বপ্নে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

পাঠকের প্রতি একটি অনুরধঃ

এই লেখাটি পড়ে যদি আপনার মনে হয় যে আরও কোন বিষয় এতে অন্তভুক্ত করা দরকার, তা আমকে অনুগ্রহ করে লিখে জানালে উপকৃত হব। আপনাদের পরামর্শ যদি যুক্তিপূর্ণ হয় এবং আমার সাদ্ধের মধ্যে থাকে তাহলে আমি তা গ্রহণ করব , ইনশাআল্লাহ্‌। এই ইমেইল ঠিকানায় লেখার অনুরধ রইলঃ bis10@live.com ; ধন্যবাদ।

পুস্তক-পুস্তিকার ফর্দ:

১) কুরআন - হাদিসের আলোকে মুসলিম পুরুষ ও নারীর করনীয়-বর্জনীয়। সম্পাদনা, ডঃ ইঞ্জিনিয়ার মশাররফ। [বইটি নিম্নোক্ত ফোন নম্বরে ফোন করে জোগাড় করা যাবে - ০১৫৫২-৩৯৯৬০০ এবং ০১৯১৫-৬০২৯৯৩]

২) রসুলুল্লাহ (সা:) এবাদত বন্দেগী। সম্পাদনা, ডঃ ইঞ্জিনিয়ার মশাররফ। [বইটি নিম্নোক্ত ফোন নম্বরে ফোন করে জোগাড় করা যাবে - ০১৫৫২-৩৯৯৬০০ এবং ০১৯১৫-৬০২৯৯৩]

৩) যাদে রাহ - পথের সম্বল (দৈনন্দিন জীবনে জরুরী হাদিসের সংকলন)। আল্লামা জলিল আহসান নাদভি। অনুবাদ - মাওলানা আব্দুল হক। সম্পাদনা - আসাদ বিন হাফিজ। প্রীতি প্রকাশন (ফোন - ০১৭১৭-৪৩১৩৬০)।

৪) কালেমা তাইয়েবা। সংকলক - মুহাম্মদ নাসিল শাররুখ। উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম - http://www.oiep.org/

৫) কুরআন ও সুন্নায় সুদ নিষিদ্ধকরণ। ইমরান নযর হসেইন। অনুবাদ - মাকসুদা বেগম ও ফারযানা ইশরাত। প্রকাশক - মাহমুদ ব্রাদার্স, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

৬) চন্দ্র মাসের ইসলামী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব বনাম ‘চন্দ্রমাস’ নামক বইয়ের বিভ্রান্তি। প্রকৌশলী মুহাম্মদ শামসুল হক চৌধুরী (ফোন - ০১৫৫২-৩১৫০৩৮), সরণী প্রকাশনী।

৭) ইসলামের অর্থনীতি। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম। খায়রুন প্রকাশনী (ফোন - ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬)।

৮) টাকার গন্ধ। ডঃ মাহমুদ আহমদ। আহসান পাবলিকেশন (ফোন - ৯৬৭০৬৮৬)।

৯) ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ২০টি বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব। ডঃ যাকির নায়িক। অনুবাদ - মস্তফা ওয়াহিদুযযামান। প্রকাশক - নাকিব পাবলিকেশন। পরিবেশক - খায়রুন প্রকাশনী (ফোন - ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৯২-১০৯৪৬৭)।

১০) বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ। মুহাম্মদ আমিনুর রহমান। রেডিয়েন্ত (ফোন - ৯৩৩৮৩৪২)।

১১) তাওহীদ জিজ্ঞাসা জবাব (১), কাজী মুহাম্মদ ইবরাহীম। মানারাহ পাবলিকেশন (ফোন: ৮৭১১১৩১-২, ৮৮৬১৩৮১, ৮৮৬১৯৪৬), আই, এস, বি, এনঃ ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৩৮৫৫-৬ ।

১২) প্রশ্নোত্তরে কিতাবুস সাওম। মুহাম্মদ জসিমুদ্দিন রাহমানী। মারকাজুল উলুম প্রকাশনা বিভাগ (ফোন: ০১৭১২১৪২৮৪৩)। www.jumarkhutba.wordpress.com

১৩) হাদিস সংকলনের ইতিহাস। মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম। খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা। আই, এস, বি, এনঃ ৯৮৪-৮৪৫৫-১৬-১ । ফোন: ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৮৭৭, ০১৭১৩-০৩৪২৪০ ।

১৪) ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষ, উপহার ও সুপারিশ – বাংলাদেশ প্রেক্ষিত। মাওলানা মহাম্মদ নূর হোসাইন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। আই, এস, বি, এনঃ ৯৮৪-০৬-১১৯৩-৩।

১৫) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। আই, এস, বি, এনঃ ৯৮৪-০৬-০৫৬০-৭ ।

১৬) মহানবীর (সা:) জীবন চরিত। ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। আই, এস, বি, এনঃ ৯৮৪-০৬-০৪৫৪-৬ ।

১৭) ইসলামের ইতিহাস (প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড)। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৮) প্রশ্নোত্তরে কিতাবুস যাকাত। মুহাম্মদ জসিমুদ্দিন রাহমানী। মারকাজুল উলুম প্রকাশনা বিভাগ (ফোন: ০১৭১২১৪২৮৪৩)। www.markajululom.com

১৯) তাবলীগ জামা'আত ও দেওবন্দিগন - একটি বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচন, তাদের ধান-ধারনা, গ্রন্থ ও দাওয়াহ সম্পর্কিত। সংকলন: সাজিদ আব্দুল কাইউম। ভাষান্তর: প্রকৌশলী আজিজুল ইসলাম ও মুহাম্মদ মমিনুল হক। সম্পাদনা: শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম ও মুহাম্মদ মমিনুল হক। প্রকাশক: সুহৃদ প্রকাশনী, ফোন: ০১৯১১৩৯০৩০০, ০১৬৭০৭০২০৬৬ । [বইটি ইংরেজি "The Jamaat Tableegh and the Deobandis" এর অনুবাদ। মূল ইংরেজি বইটি http://www.ahya.org/amm/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=6 লিঙ্ক থেকে বিনামূল্যে নামিয়ে নেয়া যাবে।]

২০) চার মাজহাবের অন্তরালে। খলিলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান। আত-তাওহীদ প্রকাশনী। ফোনঃ ০১৭১২-৫৪৯-৯৫৬, ০১৭২২-৩৩৩-৩৮৫ ।

২১) যেভাবে নামায পড়তেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ)। অধ্যাপক মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম। কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড। ফোনঃ ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬। www.kamiubprokashon.com

২২) কালেমা তাইয়েবা। মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহঃ)। আই, এস, বি, এনঃ ৯৮৪-৮৪৫৫-০০-০ । খায়রুন প্রকাশনী। ফোনঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫১৯১৪৭৭, ০১৭১২১৮৫০০০ ।

২৩) জান্নাতি দল কোনটি। মাসুদা সুলতানা রুমি। কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড - www.kamiubprokashon.com । ফোন: ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬।

২৪) অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। খলিলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ)। তাওহীদ পাবলিকেশন্স, বংশাল, ঢাকা। ফোনঃ ৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯৬৪৬৩৯৬। www.tawheedpublications.com

২৫) মাযহাবীদের গুপ্তধন। মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আল -ইসলাম রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা। জায়েদ লাইব্রেরী, ঢাকা। ফোনঃ ০১১৯১১৯৬৩০০, ৯৫৫৭১৭২।

২৬) হানাফী ফিকহের ইতিহাস ও পরিচয়। মুফতী মাওলানা আব্দুর রউফ। আল -ইসলাম রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা। আহলে হাদীস লাইব্রেরি ঢাকা। ফোনঃ ৭১৬৫১৬৬, ০১১৯১৬৩৬১৪০ ।

২৭) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণ। মূলঃ আল্লামা আবু মনসুর আহমদ ইবনে আলী আত-তাবারসী (রাহঃ)। ভাষান্তরঃ ইরশাদ আহমদ। মনোছবি প্রকাশনী, ঢাকা। আই,এস,বি,এনঃ ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৩০২২-২ । ফোনঃ ৮৬৩১৫৬৯ ।

২৮) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ঐতিহাসিক ভাষণ ও পত্রাবলী [রাসুলুল্লাহ (স) এর উপদেশবানী ও বিদায় হজ্জের ভাষণ]। সংকলন ও সম্পাদনায়ঃ এ. এস. এম. আজিজুল হক আনসারী। মীনা বুক হউস , ঢাকা। আই, এস, বি, এনঃ ৯৭৮-৯৮৪-৮৯৯১-৪১-১ ।

২৯) সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর। মশাররফ হোসেন খান। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টের, ঢাকা। আই, এস, বি, এনঃ ৯৮৪-৩১-০৭১৭-৯ ।

৩০) সালাতুত তারাবীহ। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহঃ)। তাওহীদ পাবলিকেশন্স। ফোনঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬ ।

৩১) দীন ইসলাম এর জানা-অজানা। ডঃ ইঞ্জিনিয়ার মশাররফ। মাহির প্রিন্টারস। ফোনঃ ০১৫৫২-৩৯৯৬০০, ০১৯১৫-৬০২৯৯৩, ০১৭১৪-৫৫৬০০৮ ।

৩২) ফিক হুস সিয়াম - রোজার বিধান ও মাসায়েল। মুহাম্মাদ নাসীল শাররুখ। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্সিটিউট ফর এডুকেশন এন্ড রিসার্চ। ফোনঃ ৮৯৯১১৫৭, ০১৬৭১৯৭১৪৫৭ ।

৩৩) সুন্নাতে রাসুল (সাঃ) ও চার ইমামের অবস্থান। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। তাওহীদ পাবলিকেশন্স। ফোনঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬ ।

৩৪) অজু এবং সালাত আদায় করুন যেভাবে রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) আদায় করেছেন। মূলঃ শায়খ মুহাম্মদ এস আদলী। অনুবাদঃ মোহাম্মদ এম রহমান। হুসাইন আল -মাদানী প্রকাছনী, ৩৮ নরথসউথ রোড, বংশাল, ঢাকা।

৩৫) এসো আল্লাহ্‌র পথে - ১০: কিতাবুদ দু'আ। মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী। আল - হাদীস পাবলিকেশন্স। ফোনঃ ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫ ।

৩৬) হিসনুল মুসলিম - কুরআন ও হাদীস থেকে সংকলিত দইনন্দিন যিকর ও দু 'আর সমাহার। মূলঃ সায়েদ ইবন আলী আল -কাহতানী। অনুবাদঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক আল - মাদানী। আহসান পাবলিকেশন্‌। ফোনঃ ৯৬৭০৬৮৬, ০১৭১৩৭১১৭১ ।

৩৭) গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানের কথা - বাংলাদেশে "র" - আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান। আবু রুশদ। প্রকাশকঃ জিনাফ, ভাসানী ভবন, ৫১ শান্তিনগর, ঢাকা ১২১৭। পরিবেশকঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা। আই, এস, বি, এনঃ ৯৮৪-৩১-১৪৩৮-৮।

৩৮) ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডেয়ারি। অনুবাদঃ মুহাম্মাদ এ আর খান এবং এ জে এ মোমেন। জ্ঞানকোষ প্রকাশনী , ৩৮/২ ক বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোনঃ ৭১১৮৪৪৩, ৮৬২৩২৫১, ৮১১২৪৪১ ।

৩৯) ইকামাতুস সালাত - ১। মুফতী কাজী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম। মানারাহ্ পাবলিকেশন্ , মহাখালি, ঢাকা। আই, এস, বি, এনঃ ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৩০৮২-৭।

৪০) ইসলামের বিভিন্ন দলকারীদের পরিণাম - মুসলিমগণকে অবশ্যই জানতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন আহমেদ। ৩৬/৩ ই, আহাম্মাদবাগ বাসাবো, ঢাকা ১২১৪। ফোনঃ ৭২৭৭৯০৭, ০১৭১১৩২১১৩০ ।

৪১) শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১ম-১০ম খণ্ড)। অনুবাদঃ মতিউর রহমান খান। বাংলাদেশ ইসলামিক ইন্সিটিউট; আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ফোনঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২ ।

কিছু উপকারী ওয়েব সাইট এর লিংক:

বাংলা কুরআন শরীফ: http://www.quraanshareef.org/

অনলাইন পবিত্র কোরআন: http://www.ourholyquran.com/

কোরআন হাদিস: http://www.quranhadith.org/

Search Truth: http://www.searchtruth.com/

উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম - http://www.oiep.org/

Institute for Community Development (ICD): http://icdbd.org/blog/

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: http://www.bicdhaka.com/

Masjid Council for Community Advancement - http://www.masjidcouncilbd.org/

শবে বরাত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা: http://www.quranhadith.org/bn_sabe_barat.doc

মাসিক জিজ্ঞাসা: http://www.jiggasha.com/

Islamic Online University: http://islamiconlineuniversity.com/

Al-Kauthar in Bangladesh:
http://www.mercymissionworld.org/blog/2011/05/15/alkauthar-in-bangladesh/

শাইখ ইমরান নযর হসেইনঃ http://www.imranhosein.org/

Turkish Muslim Scholar Harun Yahya: http://www.harunyahya.com/

কোরানের আলোঃ http://www.quraneralo.com/

বিদায় হজ্জের ভাষণ:
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3 এবং http://prothom-aloblog.com/posts/16/150644 এবং
http://www.sonarbangladesh.com/blog/sakerul/62619

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশঃ http://www.islamicfoundation.org.bd/

ধর্ম মন্ত্রণালয়: http://www.mora.gov.bd/

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল কোরআন সাইটঃ http://www.quran.gov.bd/

জাতীয় ই-তথ্য কোষ: http://www.infokosh.bangladesh.gov.bd/index.php

Islam on Demand: http://islamondemand.com/

Global Islamic Platform: http://www.globalislamicplatform.org/

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডঃ http://www.bmeb.gov.bd/index.php?id=1

যারা নিজের চেষ্টায় আরবী ভাষা শিখতে চান, তাদের জন্য কিছু ভাল উপকারী ওয়েব সাইটঃ

Qur'an Made Easy: http://www.quranmadeeasy.com/

Qur'an for busy people: http://quranforbusypeople.com/

Understand Qur'an Academy: http://understandquran.com/

Subulassalam: http://subulassalam.com/Vocabulary.aspx

Learn Arabic: http://www.mubashirnazir.org/QA/000200/Q0151-Arabic.htm

Qur'an word by word: http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp

LQ Toronto – Learn the language of the Qur'an:
http://www.lqtoronto.com/downloads.html

Edward William Lane's Arabic-English Lexicon (Dictionary):
http://www.studyquran.co.uk/LLhome.htm

Qur'an transliteration for non-Arabs: http://transliteration.org/quran/

Tanzil: http://tanzil.net/#1:1

Zekr – Qur'an study software: http://zekr.org/quran/en/quran-for-windows

The teaching Arabic to non-Arabic speaking:
http://iqra.mediu.edu.my/eBooks/index.htm

Umar Al-Khattab: http://umaribnalkhattab.tumblr.com/

স্বীকারোক্তিঃ

১) এ প্রবন্ধের বেশীরভাগ উল্লেখিত হাদিস ইংরেজি থেকে সরাসরি বাংলায় আমার নিজের অনুবাদ করা। কোন ভুলত্রুটি থাকতে পারে এই আনুশুচনায় আমি প্রত্যেক হাদিসের শেষে মূল উৎসের লিঙ্ক যোগ করেছি যাতে করে পাঠক সেসব যাচাই করার সুযোগ পায় । কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাকে জানালে তা আমি ঠিক করে নেব, ইনশাল্লাহ।

২) কোরআনের বাংলা অনুবাদ সরাসরি "বাংলা কুরআন শরীফ: http://www.quraanshareef.org/" থেকে নেয়া।

৩) অনুবাদের কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ গুগল অনুবাদের সাহায্যে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

৪) লেখার বিশ্লেষণ সমূহ আমার নিজের যা কিনা আমার বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করা জ্ঞান যা বিভিন্ন সময়ে নিজের উদ্যোগে বা কোন পণ্ডিতের লেখা বে আলোচনা থেকে নেয়া। আমি আমার সব লেখা আমার ব্যক্তিগত ওয়েব সাইট এ প্রকাশ করে থাকি। আমার বেশীরভাগ লেখা ইংরেজিতে। সে সব লেখা পড়ার আগ্রহ থাকলে নিম্নোক্ত লিঙ্ক এ ক্লিক করুন - Islam: The Universal Religion: http://javedahmad.tripod.com/islam/Javed.htm